৫৩১। নীলপরী ২

রাজু ও নীলা রোগীদের ভাল করতে গিয়ে তাদের হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নীলা বলে, ভুল করেছি, গরীবদের বাঁচাতে হলে আর একটা উপায় বের করতে হবে। নীলপরী, তুমি আর একটা উপায় আবিস্কার কর।

এই নাও, পরীক্ষা করে দেখ। এই চামচ দিয়ে হাড়ির ভাত তুলে নিলে ভাত ফুরায় না।

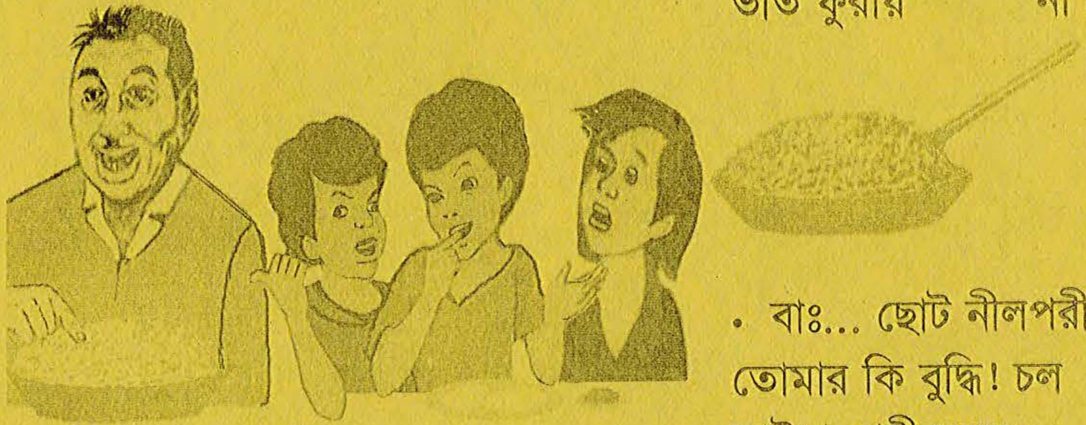

• বাঃ... ছোট নীলপরী, তোমার কি বুদ্ধি! চল ভাইয়া, গরীবদের খুঁজতে যাই। চল, ঐ বস্তির ভাতঘরে গিয়ে বসি। ঐ দেখ, এই লোকটি বিরানী খাচ্ছে, আর ওরা তিনজন খাচ্ছে শুধু দুটো রূটি আর এক চামচ ভাজি...। বয়! একটা বিরানী দাও তো... আর দুটি থালা।....দেখি আমাদের চামচ দিয়ে

বিরানি তুলে নিলে কি হয়?... বাঃ আর একটা থালা ভরে গেছে!... চল, ঐ তিনটি ছেলের কাছে যাই। ভাই, বিরানি খাবে ? আমরা আর পারছি না।

- খাব! আমার ভাইও খাবে কিন্তু !
- আমিও খাব কিন্তু!
- আমিও! আমিও! আমিও!
- একি! ও সব বিরানী কোথা থেকে পেলি ?
- নীলা বু দিয়েছে। তার থালা থেকে তুলে দিয়েছে।

- কই! চোর কোথাকার!

এসব বিরানীর জন্য টাকা ফেল!

- আমি নিজের জন্য তো টাকা দিয়েছি, টাকা আর নেই।
- টাকা নেই? আমি পুলিশ ডেকে আনব কিন্তু! টাকা ফেল !
- নীলা, চল, এক্ষুণই পালাই, নয়তো মার খেতে হবে!
- এবারও ভুল হয়ে গেছে ভাইয়া... কি করি?... ছোট নীলপরী তুমি কোথায়?

৫৩২। নীলপরী ৩

- তোমাদের কি চাই?
- ও ছোট নীলপরী,
তুমি যে চামচ দিয়েছ
তা কাজে লাগল না,
এখন কি করি?
- তোমাদের তো অনেক বুদ্ধি, তোমরাই বল, কি চাও?
- একটা ঝর্ণা দাও, তার পানি খেলে যেন বয়স কমে যায়।
- বেশ! তোমরা বলবে আব্রাকাদাব্রা, ঝরনাটা বের হবে।
- ও, ছোট নীলপরী,
তোমার মত পরী আর
নেই! চল ভাইয়া, এবার
দুঃখীদের উপকার করতে
পারব। এস রাস্তার পাশে
একটা ঝর্ণা তৈরী করি।
আব্রাকাদাব্রা!... এই তো
হয়ে গেল!

- সালাম খালাম্মা, কোথা থেকে আসছেন?
- অনেক দূর থেকে মা, আমি খুব ক্লান্ত।
- আমাদের ঝর্ণার পানি
খেয়ে যান খালাম্মা।

আবার কালো হয়ে গেছে যে!

• এই দেখ, আমার সব দাত উঠেছে, চোখেও ভাল করে দেখতে পাচ্ছি, কানেও শুনতে পাচ্ছি!

• এই কাজ ভাল হয়েছে ভাইয়া, । চল, আর একটা গ্রামে চলে যাই।

• দেরী কর, দেখ, মন্দির থেকে কারা আসছে! ওদের মুখ দেখ, শুধু বুড়ো বুড়ি। এখানে একটা ঝর্ণা করে দিতে হয়, আব্রাকাদাব্রা!

• আরে, দেখ! ঐ ঝর্ণার এক ফোটা জল মুখে দিলাম আর হঠাৎ আমার কি হল দেখ তো?

• সে কি! দেখি...? আমাদের বয়স বিশ বছর কমে গেল রে!

• চল নীলা, সারাটা গ্রাম আনন্দে ফেটে যাচ্ছে, ভাল কাজ করেছি, তাই না? অন্য গ্রামে যাই।

• না ভাইয়া, আমার যেন মন কেমন করছে। আমাদের ছোট নীলপরী যদি এখানে থাকত!

• কেন? এই যে আমি, তোমাদের আর কি চাই?

• ও, ছোট নীলপরী, আমরা সব জায়গায় ঝর্ণাটা দিয়ে যাই, কিন্তু পরে কি হবে বলতে পার?

৫৩৩। এতিমখানা

> আমার চিঠি পেলে
> দেখা করে যাও
> আমার কোন বন্ধু নেই

- এই দেখ নীলা, এতিমখানার দরজায় কি চিঠি পেয়েছি।
- ওরা তিন বেলা খায়, তাদের কাপড় আছে, ঘর আছে, মাস্টার আছে, কিন্তু... কোন দিন হাসে না। হাসে না কেন?
- চল, তাদের জিজ্ঞাসা করে আসি...

- ফাতেমা, তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার মুখ এত কালো কেন?
- কেউ আমাকে ভালবাসে না।
- কেন? এরা দু' বেলা খেতে দেয়, কাপড় দেয়, বই দেয়...
- না বুবু, মা থাকতে এক বেলা খেতাম, তবু হাসতাম। এরা হাসতে জানে না। এরা আমাদের ভালবাসে না।

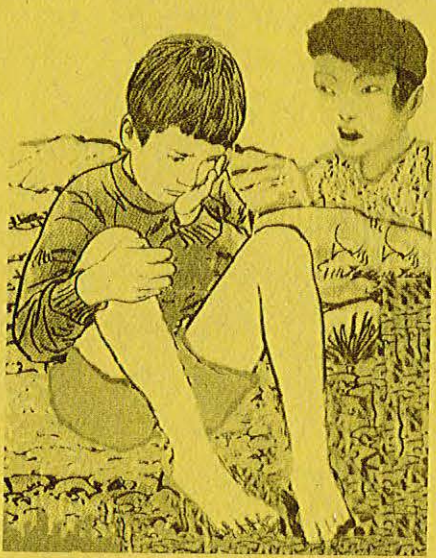

- ভুলু, কাদঁছ কেন? কেউ মেরেছে?
- কিছু ভাল লাগে না! কালকে ঈদের দিন, কেউ আমাকে নিতে আসবে না...
- আচ্ছা, যদি নিতে আসে, যাবে?
- যদি সে আমাকে ভালবাসে তাহলে যাব, এখানে আর ফিরব না কিন্তু!
- রাজু ভাই , আমরাও যাব যদি কেউ আমাদের নিতে আসে। কিন্তু...

হয়েছে বাবুল, আমার জন্য একটা লিখবি?

• ফুপা, তোমার জন্য একটা চিঠি আছে। বাবুল তোমাকে চেনে, সে তোমার কাছে থাকতে চায়। রাখবে?

• বললাম তো। রাখব।

• সে কিন্তু অনেক দুঃখ পেয়েছে। তাকে ঘরে নিলে...

• সে আমার ছেলের মত থাকবে। ভাল হোক আর মন্দ হোক, কেউ তাকে তাড়িয়ে দেবে না, বলে দিও।

• বাঃ লালুর মা, এই দেখ, ঈদের জন্য একটা উপহার পেয়েছি! একটা মেয়ে! এক্ষনই আনতে হবে!

• তোমার নাম বাবুল না? আমাকে চেন?

• আপনি আমার ঠোংগা কিনে নিতেন

আর সব সময় ভাল দাম দিতেন, আপনি... খুব ভাল মানুষ।

• তুমি আমার ঘরে আসতে চাও?

• আসতে দিলে খুব সুখী হব।

• আমিও সুখী হব খোকন, চল যাই।

৫৩৪। জিভ কাটা মেয়ে ১

মেরেঞ্জা পাহাড়ের গায়ে একটা গ্রাম আছে। গ্রামবাসীরা খুব সরল ও বুদ্ধিমান।

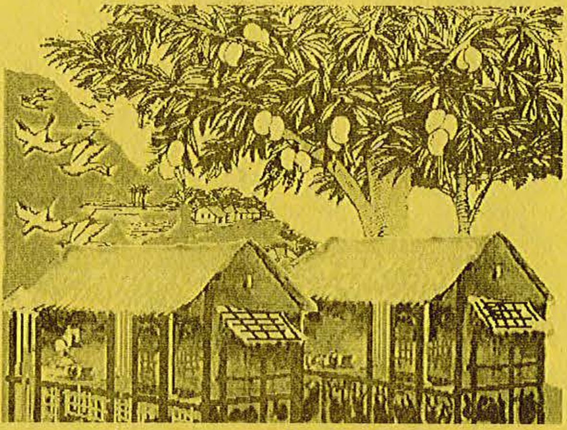

ছোট একটা ঘরে বাস করত দশ বছরের একটা মেয়ে ও তার বাবা-মা। মেয়েটি খুব সুন্দরী, তার নাম আরতি। সবাই তার হাসি দেখে হাঃ করে থাকত। কিন্তু তার একটা দোষ ছিল। তার জিভ এত ছোট যে কথা বলতে পারত না, তাই শুধু হাত-চোখ দিয়ে ও শিস দিয়ে কথা বলত, তবে ছেলেমেয়েরা সবাই তার কথা বুঝতে পারত। আর একটা দোষ ছিল। যখন কোন ভিক্ষুক ঘরে আসত ও তাকে একটা গল্প শুনাত, সে তাকে দু'হাত ভরে চাল ঢেলে দিত।

তার জন্য রোজ মা-বাবার বকুনি খেতে হত, তবু দোষ সারত না। মা বাড়ী এসে দেখত চাউলের হাড়ী অর্ধেক হয়ে গেছে। তখন বকত। আরতি বলত, পাঁচজন ভিক্ষুক এসেছে !

এক দিন বাড়িতে এল এক ভিখারিনি। তাকে এমন একটা গল্প শুনাল যে আরতি হেসে হেসে আর পারে না।

শেষে হাড়িতে হাত দিয়ে দেখল চাল খুব অল্প, দুপুরের ভাতও হবে না। আরতি হাড়িটা ধরে বুড়ির আঁচলে উল্টিয়ে দিল, হাড়িতে একটা চালও রইল না। বুড়িটি যাবার সময় বলল, দোয়া করি মা, জীবনে সুখী হও।

পাঁচ মিনিট পর মা জুম থেকে ফিরে এল তরকারি নিয়ে। রান্নাঘরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডাকল, মা, এ দিকে এস তো? এত চাউল কে দিয়ে গেছে?... আরতি গিয়ে দু' চোখ মোটা করে তাকাল। হাড়িটা ভর্তি। এক সপ্তার চাউল। আরতি সরু পথের দিকে তাকাল। বুড়িটি অনেক দুরে চলে গিয়েছিল। ঐ বুড়িটি কে?... আরতি হরিণের মত দৌড়াতে পারত। অল্পক্ষনের মধ্যে তাকে ধরে ফেলল। বুড়ি হেসে বলল, যাও মা,

আমি চাঁদের পরী, তোমার হাড়ির চাউল আর কোন দিন ফুরাবে না। বলে বুড়িটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আরতি একটি আম গাছের তলে বসে পড়ল। বসে বসে অনেক্ষণ ভাবতে লাগল। গ্রামে একটা সরল গান প্রচলিত ছিল, সবাই তার সুর জানত। আরতি জিভ দিয়ে গান করতে পারত না, তাই শিস দিয়ে গান বাজাতে লাগল

৫৩৫। জিভ কাটা মেয়ে ২

পরের দিন সকালে আরতি ঝর্ণার পানিতে গোসল করল। ফিরে আসার

পথে অনেক সুন্দর ফুল তুলে নিয়ে আসল। তারপর তিন ঘনটা ধরে চুল বাঁধল। তারপর তাতী মেয়ের কাছে গেল ও তার নতুন পোষাক পড়ল। তাতী মেয়েটি বলল, তুমি যে এত সুন্দরী আমি জানতাম না মা!

আরতি তখন বাড়ি ফিরল না। গ্রামের মাঝের পথ ধরে গ্রামের শেষ প্রান্তে যেতে লাগল। মেয়েরা তার চারিদিকে ভীড় করল। সবাই পর পর তাকে বলতে লাগল, তুমি যে এত সুন্দরী আমরা তা জানতাম না বুবু। যুবকরা তাদের কাজ ফেলে চলে আসল। একজন গাইল, - আসবে তুমি সোনার কন্যা - আসবে আমার ঘরে? আরতি হেসে শিষ দিয়ে উত্তর দিল, না রে না, তোর মুখটা কালো - সইতে পারব না রে। মেয়েরা সবাই হাসল। আর এক যুবক গাইল - আসবে তুমি সোনার কন্যা - আসবে আমার ঘরে? আরতি শিষ দিয়ে উত্তর দিল, আসব না ভাই , লোকে তোরে - চক্ষু টেড়া বলে। মেয়েরা সবাই আরও জোরে হাসল। আরতি এগিয়ে গেল। গ্রামের শেষ প্রান্তে গল্পওয়ালার বাড়ি। গল্পওয়ালার নাম আনন্দ। তার বয়স পঁচিশ বছর। কেউ তার মত গল্প বলতে জানে না, ছোট বড় সবাই শুনতে আসে, সবাই হাসে, কাঁদে, ও রোজ এক ঝুড়ি ভরা খুশী নিয়ে বাড়ি ফিরে

যায়। আনন্দ আমগাছের তলে বসে আজকের গল্প শুনাচ্ছিল। আরতি গাছের আড়ালে বসে গল্পটি শুনতে লাগল। সেও হাসল, কাঁদল, ভয় পেল, আনন্দ করল। গল্পটা শেষ হয়ে গেল।

আরতি গাছের পিছন থেকে বেরিয়ে শিষ দিতে লাগল,

- তোমার হাসির মত হাসি - নেই তো সারা গাঁয়ে
- তোমার কাছে হাসি ভরা - গল্প শুনা যায়।
- আমার মত সোনার কন্যা - পাবে না কোথায়
- করবে তুমি সোনার ছেলে - আমার পরিচয়?

গল্পওয়ালার মনে আনন্দ ধরে না। সঙ্গে সঙ্গে বাকি গান ধরল,

- তোমার কথা ভেবে মরি এই তিন বছর ধরে,
- এস তুমি সোনার কন্যা - এস আমার ঘরে।

আরতি বলল, চল বাবার কাছে যাই, কালকে আমাদের বিয়ে।

বাবার সঙ্গে কথা শেষ হলে আরতি বরকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমাকে কি দেবে? আনন্দ বলল, আমার সবচেয়ে দামী সম্পদ তোমাকে দান করব, কালকে দেখতে পাবে। আর তুমি আমাকে কি

দেবে? আরতি বলল, আমিও আমার সবচেয়ে দামী সম্পদ তোমাকে দান করব, কালকে দেখতে পাবে।

পরের দিন সবাই আনন্দ ও আরতির বিয়ে দেখতে এল। সবাই ডাল ভাত খেল। এত ভাত কোথা থেকে এল তা কেউ জানতে পারল না।

তারপর দুজনেই তাদের উপহার খুলে দিল। আনন্দ বলল, তুমি তো বই পড়তে পার, আর তুমি গল্প ভালবাস। এই বইটি নাও। এটা আমার গল্পের বই। এর চেয়ে সুন্দর বই জগতে নেই। আরতি বলল, আমার উপহার হল এই হাড়িটা। এটা কোন দিন খালি থাকবে না। তোমার আসল কাজ হল গল্প বলা। তোমার গল্প না শুনে এই গ্রামের মানুষ বাঁচতে পারবে না। সুতরাং ভাতের ভাবনা আমার হাতে ছেড়ে দাও। তুমি শুধু তরকারী যোগাড় করবে, গান করবে আর গল্প শুনাবে।

আনন্দ ও আরতির দুটি ছেলেমেয়ে হল, তাদের কিন্তু একটা করে আস্ত জিভ আছে। তারা মায়ের মত সুন্দর, আর বাবার মত পরিস্কার কথা বলতে পারে।

৫৩৬। ন্যায় আর অন্যায়

"ছোটভাই ডিম পেয়েছে, আমি পাব না কেন?

"ডিম আর নেই বাবা। তোমার ভাই ছোট, বড় হওয়ার জন্য তার ডিম খেতে হবে, তুমি এখন বড় হয়ে গেছ, তোমার ডিম না হলেও চলে।

"এটা কিন্তু অন্যায়!

"কি বললে?... অন্যায়! অন্যায় মানে কি?

"মানে... সমান হল না, ন্যায্য হল না, আর কি।

"আচ্ছা, তোমার বোন বুকের দুধ খায়, তুমি খাবে?

"না, না! কিন্তু...

"শোন বাবা, তিন বৎসর আগে তোমার টাইফয়েড হয়েছিল, মনে আছে?

"কত বার শুনেছি সে গল্প। আমি নাকি পনের দিন কথা বলতে পারিনি, সবাই মনে করেছিল মরে যাব... আমার কিছু মনে নেই।

"তুমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলে। আমরা সবাই তোমার পাশে ছিলাম। তোমার ভাই ও বাবার জন্য রান্না করার সময়ও পেতাম না। কতদিন ওরা না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেটা কি অন্যায় হয়নি? কিন্তু সে অন্যায় না করলে তোমাকে বাঁচাতে পারতাম না বাবা। এবার বুঝলে? সব কিছু সমান ভাবে ভাগ করা যায় না।

"থাক্ মা, আর বলব না।

৫৩৭। সোজা কথা ১

সে সময় আমরা ক্লাস সেভেনে পড়তাম। তখন আমাদের হাই স্কুল খুব খারাপ ছিল, কেমন করে ভাল হয়ে উঠল এই গল্প তার কাহিনী।

তার আগের বছরে আমরা একটা খবরের কাগজ মাসে মাসে ছাপিয়েছিলাম, তাতে সব ছাত্রদের খুব উপকার হয়েছিল। বছরের শেষে এই চিঠি সবাইকে লিখে দিলামঃ-

প্রিয় ভাই-বোনেরা,

আমি তোমাদের খবরের কাগজ "সোজা কথা"। গত বছর তোমাদের জন্য অনেক কাজ করেছি, এখন আমি ক্লান্ত। আগামী কয়েক মাস আমার গুহার ভিতরে বিশ্রাম করব। তবে দরকার হলে আমাকে জাগিয়ে তোল। আমি মরিনি, শুধু ঘুমাচ্ছি। ইতি,
"সোজা কথা"

কিন্তু "সোজা কথা " শুধু ঘুমাচ্ছে, এই খবর কয়েকজন শিক্ষক জানত না। তারা মনে করল সে মারা গেছে, খবরের কাগজটি আর নেই। তাই নিজের আয় বাড়াবার জন্য বলতে শুরু করল, ছেলেমেয়েরা, আমার শালা ঢাকায়

• তুমি তো জান, আমরা পরীক্ষার প্রশ্ন আগে-বাগে জেনে নিয়েছিলাম আর তাই দেখে দেখে সারা সপ্তা চর্চা করেছি।
• না, জানতাম না। তবে চর্চা করলেও ফার্স্ট হতে বুদ্ধি লাগে।
• বাদ দাও পুই, বরং তোমাদের ঐ ভাল্লুকটা জাগালে কেমন হয়? যদি কাগজটা ছাপাও, আমাকেও দলে নাও। আগামী মাসে যদি পাস করি আমি নিজের জ্ঞানে পাস করতে চাই, ফাকি দিয়ে পাস করতে চাই না।
মামুদের কথা পুইএর ভীষন ভাল লাগল। বলল, মামুদ, তুমি ভাল্লুকের দলে যোগ দিলে আমি খুশি হব।

নতুন বছরের শুরুতে তিন সপ্তার ছুটি হল, বাজারে না কি নতুন বই বের হয়নি। পরের সপ্তায় অধিকাংশ মাস্টার আসেনি। তখন পুই মিটিং ডাকল। এবার দলে তারা এগারজন। কিন্তু তাদের মনে কোন উৎসাহ নেই। যুদ্ধ ঘোষনা করতে তাদের ইচ্ছা নেই। তারা বলল, পুই, ঐ খবরের কাগজের জন্য আমাদের কত দুঃখ পেতে হল তুমি তো জান... বাবা-মা বলে শিক্ষকদের নামে কিছু লিখলে ওরা আমাদের পাস করতে দেবে না... এই কাগজ ছাপানো ছাড়া যদি অন্য কোন উপায় থাকে তো বল।
মাহমুদ দলে নতুন এসেছে, তাই কথা বলতে চাচ্ছিল না। কিন্তু ওদের নিরাশা দেখে বলে উঠল, তোমরা যে চার-পাঁচজন শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দাড়ালে, তারা জানত, তোমরা ক্লান্ত হয়ে যাবে... তবে আমি ভাবতেই পারিনি তোমাদের দল এত তাড়াতাড়ি লড়াই ছেড়ে দেবে... যাক,

পুঁই সবাইকে কাজ ভাগ করে দিল। কাজটা খুব জটিল। খবর নিতে হবে, কেন হেডমাস্টার তিন সপ্তা ছুটি দিয়েছে, পরের সপ্তায় কেন মোট পয়ত্রিশটা ক্লাস হয়নি, টাইম টেবল দেখে একটা তালিকা করতে হল কোন শিক্ষক কয় বার ও কোন অজুয়াতে ক্লাস করেনি। তারপর তদন্ত করতে হল তার দুই বছরের ছেলে সেই দিন সত্যি মুমুর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল কি না, আরও দুজন শিক্ষকের ম্যালেরিয়া হয়েছে কি না, ইত্যাদি। পুই তাদের পরিস্কার বলে দিল:- শোন, এবার আমরা একটি অক্ষরও ছাপাতে পারব না যদি তার প্রমান দেখাতে না পারি। কাগজে একটা ভুল খবর ছাপালে, ওরা আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে, তখন কাগজটা বন্ধ করা ছাড়া উপায় নেই। এই দেখ আমাদের কাগজের নতুন মুখ।

সোজা কথা ঃ
কোন মিথ্যা বলব না,
কোন সত্য লুকাব না।

দু' দিনের মধ্যে সবাই টের পেয়ে গেল, ভাল্লুক আর ঘুমিয়ে নেই। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকরা একটা মিটিং ডাকল। শামীমার দুলা ভাই হাই স্কুলের সেক্রেটারী, তাই শামীমা খবর পেল। এক ঘন্টা পরে তেরজন ছাত্র পুইদের বাড়িতে এসে বসল। পরামর্শ ও লেখালেখি চলল রাত একটা পর্যন্ত। সকাল সাতটায় কাগজ ছাপানো হল। সেই দিন স্কুলের শেষে হেডমাস্টার তেরজনকেই অফিসে ডাকলেন। পাঁচজন শিক্ষক তার সঙ্গে বসে ছিল। সবার মুখ অন্ধকার।

হেডমাস্টার বললেন, কে সবার পক্ষে কথা বলবে? শিমকি, হাসছ যে?

- মাফ করবেন স্যার, আমরা ঐ ভাবে কাজ করি না, আমাদের একটা

• না স্যার। আমি পরামর্শ চাইলে বাবা-মা দেয়, কিন্তু হুকুম দেয় না! সব সিদ্ধান্ত আমার মাথা দিয়ে করি। আমার কোন গুরুজন নেই।

• তাহলে আমরা শিক্ষক তোমাদের কি হই?

• আপনারা বেতন পান আমাদের পড়াবার জন্য। তবে এই কাজ করতে যে পরিশ্রম ও ভালবাসা লাগে, টাকা দিয়ে তা কেনা যায় না। এই কাজ ভালমত করলে, আপনারা আমাদের সারা জীবনের বন্ধু... আর না করলে... আমাদের সারা জীবনের শত্রু।

• বেশ, কিন্তু আমরা ভালমত কাজ করি কি না, সে বিচার করবে কে?

• হেডমাস্টার হিসাবে এইটা আপনার দায়িত্ব স্যার, তবে আপনি যদি করতে না পারেন তাহলে আমরা অন্য ব্যবস্থা করব!

• কি ব্যবস্থা করবে শুনি?

• স্যার, আমরা জানি আপনারা আমাদের বিচার মানবেন না, তাই আমরা শুধু স্কুলের খবর বাবা-মাকে জানাব। তারা বিচার করে বলবে এ স্কুল আমাদের উপযুক্ত কি না।

এবার অংকের স্যার গর্জন করে উঠল,

• তাই বলে তোমরা আমাদের নামে আবল-তাবল ছাপাবে, সারা টাউনে আমাদের দুর্নাম রটাবে, আর আমরা তোমাদের পড়াব? বেয়াদবের দল! শুকরের বাচ্ছা! ধাপ্পাবাজ!

• মাফ করবেন স্যার, আমি আপনার শেষ বাক্যগুলো বুঝতে পারিনি, দয়া করে আবার বলবেন?

হেডমাস্টার বলল, সে কথা এখন থাক শিমকি, পরে জিজ্ঞেস কর।

৫৪০। আলমগীর কেন প্রাণ দিল

তারা ছিল ন'জন। যুদ্ধের শুরুতে বিলের মধ্যে ছোট একটা ঘরে বাস করতে এসেছিল। রাত্রে বের হত তাদের দুটো ডিঙ্গি বেয়ে, পাঞ্জাবীদের সর্বনাশ করার জন্য। ঘরে ফিরে আসত রাত থাকতে, কেউ যেন তাদের ঠিকানা না পায়। তাদের ক্যাপ্টেন ছিল আলমগীর, পাশের গ্রামের ছেলে, তার বয়স পঁচিশ বছর। সেই রাতে আলমগীর তার দল নিয়ে চারটার সময় অভিযান থেকে ফিরে এসে ঘুমাতে পারেনি, শুধু চারিদিকে আবছা অন্ধকারে তার দূরবীন তাক করছিল। হঠাৎ তার ভাইকে জাগালঃ- শ্যামল, ওরা আমাদের খুঁজে পেয়েছে, সত্তর-আশি জন হবে, ঐ দেখ, সোজা আমাদের দিকে আসছে। শোনঃ- আমি ছোট নৌকায় পশ্চিমের দ্বীপে চলে যাচ্ছি। সেখান থেকে মেশিন গান দিয়ে গুলি ছুড়তে থাকব। তারা যখন সবাই আমাকে নিয়ে ব্যাস্ত হবে তখন তোমরা বড় নৌকায় উঠে ধানের মধ্য দিয়ে পূর্ব দিকে দ্রুত বেগে চলে যাবে। সাবধান, টু শব্দও করতে পারবে না...। এর পর আলমগীর তার ভাইকে আলিঙ্গন করে ওর কানে কানে বলল, মা-বাবাকে বলবে, আমি দুঃখিত, অন্য কোন উপায় ছিল না...। এই বলে ছোট নৌকায় উঠে লগি ঠেলতে লাগল। পিছনের দিকে আর তাকাল না... পাঞ্জাবীদের নৌকাগুলো কাছে আসতে লাগল, কিন্তু পশ্চিমের দীপ থেকে যেই গুলির শব্দ শুনতে পেল, সেই দিকে ভীড়ল। পুরো তিন ঘন্টা বিলের উপর দিয়ে বন্দুক, মেশিন-গান ও বোমার কান ফাটা বিকট শব্দ শুনা গেল, তারপর বিল নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পরের দিন যুবকরা ফিরে এসে তাদের আস্তানা পেল না, পশ্চিম দীপের ঘরও পেল না, সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তারা আলমগীরের লাশ গ্রামে নিয়ে গেল। যখন শ্যামল তার ভাইয়ের রক্তমাখা কাপড় পাল্টাতে গেল তখন তার বুকের পকেটে একটা ছোট ব্যাগ পেয়ে মায়ের হাতে দিল ।

মা সেটা খুলে একটা কাগজ পেল। কাগজের অবস্থা দেখে বুঝতে পারল,

আলমগীর সেই কাগজ শত শত বার খুলেছে, আবার যত্ন করে রেখেছে। যুবকদের জিজ্ঞাসা করল, এই কাগজের মানে কি, তোমরা বলতে পার? কামাল আলমগীরের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়েছিল। বলল, আমার পকেটে ঠিক সেই তারিখে লেখা একটা কাগজ আছে। আট বছর আগে আমরা ক্লাস টেনে পড়তাম। তখন বর্ষাকাল। ঐ দেখুন, জুলাই মাসের ১৫ তারিখ। কি যেন পরীক্ষা হয়েছিল, সবাই ফেল করেছিলাম, সকলের মন মরা মরা। হঠাৎ আমাদের স্যার সবাইকে একটা করে কাগজ দিলেন। বললেন, দেখ, এই কাগজে তোমাদের সকলের নাম লেখা আছে। তোমরা প্রত্যেকের নামের পাশাপাশি লিখবে তার কি কি গুন আছে যার জন্য তোমরা তাকে পছন্দ কর। স্যার আমাদের কাগজগুলো নিয়ে চলে গেলেন। পরের দিন আমরা তার কাছ থেকে আর একটা কাগজ পেলাম, তাতে আমাদের প্রত্যেকের নামে সবাই যা লিখেছে স্যার তা নকল করে ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখে হাসি ফুটল। সবাই তাদের কাগজ যত্নের সঙ্গে ভাজ করে রেখে দিল। আলমগীরের নামে আমরা কি লিখেছিলাম আমার মনে নেই, তবে এইটুকু জানি যে তাকে নিয়ে আমরা সবাই গর্ব করতাম। আলমগীর এই কাগজ যদি না পেত, তাহলে আজ এত সাহস করত না... আর আমরা সবাই মরে যেতাম। স্যার বার বার বলতেন, কারও পছন্দ কিছু দেখলে তার প্রসংশা কর। তোমাদের ভালবাসা ওর কোন কাজে লাগে না যদি সে তা জানতে না পারে।

৫৪১। রিজিয়া কেন বেঁচে গেল

রিজিয়া ক্লাস টেন শেষ করছে। এই শেষ পিরিয়ডে আপা চিত্র আঁকার ক্লাস নিচ্ছে। আপা বলেছে, আজ তোমরা আমার জন্য নিজেদের একটা চিত্র আঁক, ভবিষ্যৎ জীবনে কি করতে চাও তা যেন জানতে পারি। আমি তোমাদের ছবি রাখব ও তোমাদের কথা স্মরন করব। সকলে যত্নের সঙ্গে তাদের ছবি আঁকতে লাগল, তবে রিজিয়ার দিকে চেয়ে আপা চমকে উঠল। বার বার সে চাদর দিয়ে দুটি চোখ মুছে।

. তোমার কি হয়েছে রিজিয়া?

. আর দেখা হবে না আপা, আমি আর স্কুলে আসব না।

আপা বুঝতে পারল তার দুঃখ শুধু স্কুল ছেড়ে যাওয়র দুঃখ নয়, তার সঙ্গে আরও অনেক দুঃখ মিশে আছে।

ক্লাসের শেষে সবাই তাদের ছবি আপাকে দিয়ে বিদায় নিল। সকলের পিছনে এল রিজিয়া। তার ছবি দেখে আপা ভয় পেল। মুখটা ঠিক রিজিয়ার মত, তার দুটি চোখ বন্ধ, চুল এলোমেলো, সে মাটিতে বসা, তার মাথা একটা চেয়ারে হেলান দেওয়া, তার হাতে একটা কালো শিশি... আপা ছবির দিকে অনেক্ষণ চেয়ে রইল...। শেষে বলল, রিজিয়া, এই চিত্র হল পাকা শিল্পীর কাজ, আমাদের স্কুলে কেউ তোমার মত আঁকতে পারে না। আমার সঙ্গে চল, শহরের সবচেয়ে দক্ষ শিল্পীদের নিয়ে আমরা একটা ক্লাব খুলেছি, আর আমি তা পরিচালনা করি। তুমি ভর্তি হবে ও প্রতি সপ্তা আমাদের একটা চিত্র

এঁকে দেবে। ছবি বিক্রী করা হবে ও প্রতি বছর একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। রিজিয়ার গাল বেয়ে চোখের পানি একটা ঝরনার মত পড়ছিল। শেষে বলল, আপা, কিন্তু... আমি যদি না বাঁচি?...

. মা, তোমার মত মেয়েকে আমরা মরতে দেব না! তোমার জীবন শুধু তোমার নয়। তোমাকে তৈরী করতে ও মানুষ করতে আমরাও জীবনের কয়টি বছর খরচ করেছি। আর আমরা কি তোমাকে নর্দমায় ফেলে দেব?... তখন রিজিয়া সব কথা বলে ফেলল। পনের বছর বয়সে তার বিয়ে হয়ে গেছে, শ্বশুর বাড়িতে ছয় মাস থাকার পরে গত বছর পালিয়ে এসেছিল, কিন্তু আগামী কাল তাকে ফিরে যেতে হবে। স্বামী লোহার মত কঠিন, শাশুড়ী নিজের জীবনে যত অত্যাচার সহ্য করেছে তা নতুন বউএর উপর ঝেড়ে দেয়। রিজিয়ার ভবিষ্যৎ জীবনে কোন আলো নেই, কোন আশা নেই। সে মরতে যাচ্ছে, শ্বশুর বাড়িতে হোক আর বাপের বাড়িতেই হোক।

আপা বলল, পনের বছর বয়সে কেউ তোমাকে বিয়ে দিতে পারে না। আমার ভাই উকিল, সে বিয়েটা বাতিল করে দেবে। কেউ আপত্তি করতে পারবে না। আমার ক্লাব তোমাকে কাজ দেবে। তুমি নিজের খরচে আরও তিন বছর পড়তে পারবে, চল।

আজ রিজিয়া আর্ট কলেজের শিক্ষিকা। তার জীবনে সূর্য উঠেছে।

৫৪২। ডাক্তারের চিঠি

বাবুল আমার ভাইপো। সে ঘন ঘন সরকারী হাসপাতালে আমাকে দেখতে আসে। সেখানে আমি রোগী দেখি। স্কুলের পরে আসে, চুপে চুপে আমার পাশে বসে পড়ে, রোগীরা চলে গেলে আমাকে পিড়াপিড়ি করে চলে যাওয়ার জন্য। বাজারে আমি এক কাপ চা খাব আর সে খাবে একটা আইসক্রীম।

আজ রোগী অনেক, উপরন্ত তাদের দুই একজন খুব বখাটে আর আমি জোর করে তাদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। বাবুল আমার পাশে বসে উস-খুস করতে থাকে, আমি কখন উঠব! শেষ রোগীটা চলে গেলে সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে, ও তার মনের কথা বলে ফেলে,

. চাচা, রোগীদের সঙ্গে তুমি এত গল্প কর কেন? তাদের রোগ বুঝতে তোমার সময় লাগে না, তারপরে ওষুধ লিখে দিলে তো ল্যাথা চুকে যায়! এত সময় নষ্ট কর কেন? আমি লক্ষ্য করেছি, তোমার পাশে যে ডাক্তার ছিল সে বারটা রোগী দেখেছে, আর তুমি মাত্র সাতজন ।

. বাবুল, বড় হলে তুমি বুঝতে পারবে যে রোগ সারাবার জন্য ওষুধ যতটুকু কাজে লাগে ডাক্তারের মুখের কথা তত কাজে লাগে। আমি যদি তাদের অভ্দ্র ভাবে বিদায় দিই তাদের রোগ সারবে না। আমার সঙ্গে আলাপ করে তাদের মনের সাহস বেড়ে যায় তাই ওদের অসুখ সারে।

. সেইজন্য কি সবাই তোমাকে বড় ডাক্তার বলে ডাকে চাচা?

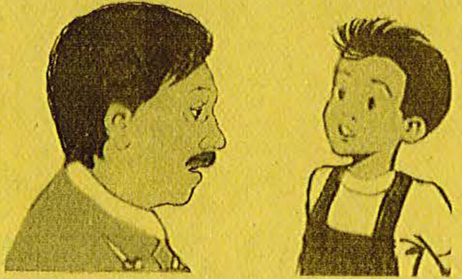

. জানি না বাবুল, কিন্তু আমার পাশে যে ডাক্তার ছিল সে তার জীবনের একটা মর্মান্তিক ঘটনা আমাকে বলল, শুনলে তুমি বুঝবে কেন আমি রোগীদের সঙ্গে সময় নষ্ট করি। বলব, না তুমি

বাড়ি যেতে যেতে ডাক্তার নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। যে রোগী মারা গিয়েছে তার মরে যাওয়ার কোন কারণ ছিল না। মরে গিয়েছে তার চিঠির জন্য। চিঠিতে লেখা ছিল, আপনাকে আর কোন উপকার করতে পারলাম না, আমি দুঃখিত। আল্লাহর নাম স্মরন করুন। তিনি আপনার জীবন আরও দুই-এক মাস বাড়াতে পারেন।

এদিকে যে রোগী সুস্থ হল তার চিঠিতে লেখা ছিল, এই ওষুধ খেয়ে দুই মাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবেন ইন্‌শাআল্লাহ। চিঠি দুটো খামের মধ্যে রাখার সময় ডাক্তার ভূল করেছিল, তাই খারাপ রোগী সুভ সংবাদ পেল ও মনের আনন্দে সুস্থ হয়ে গেছে, এ দিকে তার বন্ধু মৃত্যুর জন্য তৈরী হল, আর সমস্ত সাহস হারিয়ে মারা গেছে। বুঝলে তো বাবুল? যে ডাক্তার রোগীর সাহস ও মনের বল যোগাতে পারে সে হল সত্যিকার ডাক্তার। তা করার জন্য কিন্তু সময় ব্যায় করতে হয়। সেজন্য তো রোগী দেখতে আমার বেশী সময় লাগে, আর এই জন্য আমার অধিকাংশ রোগী সারে। তবে তাদের অর্ধেকের বেশি, ওষুধের জন্য সারে না। সারে আমার হাসির জন্য, আমার ব্যবহারের জন্য।

৫৪৩। বিচার

রবিউল দিন মজুরি খাটে। আজ কালু মিয়ার ক্ষেতে ধান কাটছে। আজ তার জ্বর। অন্যদের মত দ্রুত কাজ করতে পারছে না। কালু মিয়া রেগে যায়। বলে, ফাঁকি দিস নে রবিউল! রবিউল কালুর মুখে চোখ তুলে বলে, আপনি আমাকে চেনেন। আমি ফাঁকি দিই না। কিছুক্ষণ পরে কালু আবার রেগে বলে, শালা ফাঁকিবাজ! রবিউল বলে, গালি দেবে না বলছি, আমি ফাঁকিবাজ নই! কালু বলে, শালা শুয়োর, সাহস দেখেছ! রবিউল এবার ক্ষেপে যায়। কাস্তে দেখিয়ে বলে, জান নিয়ে পালাও!

৫৪৪। বোবা মেয়ের দাম

ন্‌জমাকে সবাই বোবা মনে করত। তার মুখ থেকে একটা শব্দ বের করতে শারাশী লাগত। স্কুলে আপা কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে চুপ করে থাকত। দুই বার জিজ্ঞাসা করলে কেঁদে ফেলত। তবে তার খাতা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন তাই আপা তাকে বকত না ও ক্লাস্‌ ফোরে উঠিয়ে দিয়েছে। ছেলেমেয়েদের কিন্তু মায়া নেই, সবাই তাকে বোবা নাচ্‌ বলে ডাকত। স্কুলে কারও সঙ্গে তার কথা নেই। শুধু ফাতেমার সঙ্গে কথা বলত। ফাতেমার বয়স ছয় বছর, তাকে স্কুলে নিয়ে যাবার জন্য ওর মা নাজমার হাতে সপে দিয়েছে, ঘর থেকে বের হলে নাজমা তার হাত ধরত ও তাকে ক্লাসে না বসানো পর্যন্ত এক সেকেন্ডের জন্যও ছাড়ত না। আজ আপা ছাত্রদের দিকে চেয়ে আছে। রাস্তা থেকে তারা পাঁচটি ধাপ বেয়ে স্কুলের উঠানে উঠছে। সবাই দৌড়াচ্ছে, তবে নাজমা দৌড়াচ্ছে না, সে ফাতেমার হাত ধরছে।

হঠাৎ নাজমা থেমে গেল। এক বুড়ো লোক খুব কষ্টে ধাপগুলো বেয়ে উঠতে চেষ্টা করে, বার বার থেমে যায়। কোন ছেলে বা মেয়ে তাকে সাহায্য করার কথা ভাবে না। নাজমা এবার ফাতেমার হাত ছেড়ে দিয়ে বুড়ার কাছে যায়। তার হাত ধরে নিজের কাঁদের উপরে বসায়। বলে, দাদু কোন চিন্তা

এক দিন আপা তাকে ডেকে বলল,

. নাজমা, আমার খাতায় তোমার নাম কোথায় উঠেছে দেখে যাও। ছয় মাস আগে তুমি ছিলে শেষের দিকে, তোমার রোল নম্বর ছিল বত্রিশ, আর এই মাসে তোমার নাম দেখ, চার নম্বরে উঠেছে, প্রায় সকলের আগে। তোমার কি মন্ত্র আছে বল তো?

. কোন মন্ত্র নেই আপা, বিশ্বাস করুন।

. তা হলে এত দ্রুত উন্নতি করলে কি ভাবে?

. আগে লেখাপড়া আমার কোন কাজে লাগত না, এখন আমার শিখাতে হয়, ভাল করে না বুঝলে শিখাতে পারি না, তাই শিখতে হল।

. কিন্তু তোমার উন্নতি শুধু পড়ালেখায় নয়। কালকে মেয়েরা এক জায়গায় বসে তোমার বিষয়ে আলাপ করছিল। কি বলছিল জান? নাজমা দিন দিন সুন্দরী হয়ে যাচ্ছে। কি খায় সে?

. আমি কিছু খাই না আপা, বিশ্বাস করুন। আগে হাসতাম না, এখন হাসি, তাই আমাকে সুন্দর দেখায়, আম্মাও তাই বলে।

. আগে হাসতে না কেন?

. কেউ আমাকে ভালবাসত না আপা। শুধু হিংসা করত।

. আমিও তোমাকে ভালবাসতাম না?...

. জানি না আপা, আপনি তো কিছু বলতেন না। কি করে জানব?

আপার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। এই বিশ বছর মাষ্টারী করছে, কোন দিন এত বড় ধাক্কা খায়নি। মনে মনে বলল, আজ থেকে যদি কাউকে ভালবাসি সে তা জানতে পারবে, আমার ভালবাসা আর কোন দিন বোবা হয়ে থাকবে না।

৫৪৬। গরীবের দান

আজ মেলার শেষ দিন। আমাদের গ্রামে নতুন মসজিদ তৈরী হচ্ছে। ইমাম সাহেব সারাদিন মসজিদ তৈরীর কথা প্রচার করছেন। ধনী-গরিব সবাইকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করছেন, বলছেন, যারা আল্লার ঘর তৈরী করতে টাকা দান করে, তারা সত্তর গুণ ফিরে পাবে আর বেহেশ্‌তে সবার সামনে স্থান পাবে। মেলায় খরচ করার জন্য আব্বা আমাকে পাঁচ টাকা দিয়েছিলেন, তা থেকে আমি এক টাকা দান করেছি। টাকা ইমাম সাহেবের সামনে ধামার ভিতরে জমা রাখা আছে। ধামাটা ভর্তি হয়ে গেছে। এক টাকা, পাঁচ টাকা, একশ' টাকার নোট পর্যন্ত আছে। সন্ধ্যার সময় টাকা গোনা হবে, সবাই দেখতে এসেছে। এমন সময় সুফিয়া খালা এল। সে খোয়া ভাঙ্গে। গত বছর ওর স্বামী

মারা গেছে। ওর তিনটি ছেলেমেয়ে আছে। ভয়ে ভয়ে সুফিয়া খালা ধামার কাছে এগিয়ে গেল। তার হাতে দু'টি টাকা। ধামার ভিতর দেওয়ার সময় একটার উপর একটা পড়ে ঠং ঠং করে আওয়াজ হল। নীরবতার মধ্যে শব্দটা সবাই শুনতে পেল। শব্দ শুনে কালু মিয়া, গোলাম সাহেব, তেলা মিয়া হেসে উঠল। একটু আগে তারা তিনজনই সবাইকে দেখিয়ে একশ করে টাকার নোট দিয়েছে। তাদের হাসি দেখে আমার বিশ্রী লাগল।

ইমাম সাহেব সুফিয়া খালাকে বললেন, দোয়া করি মা, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। তারপর মাইকে মুখ লাগিয়ে বললেন, শোনেন

ভাই সব, আমরা সবাই যে যা টাকা দিয়েছি, তা হয়ত আমাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সুফিয়া আপা যা দিয়েছে, তা নিজের ছেলেমেয়ের মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে। সে দিয়েছে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। আমি ভাবলাম, আমাদের ইমাম সাহেবের দাম আছে।

৫৪৭। মোস্তফা কামাল

যারা বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য অস্ত্র ধরেছিল তাদের মধ্যে মোস্তফা কামাল স্মরনীয়। তিন দিক থেকে শত্রুরা তার ছোট দলকে ঘিরে ফেলেছিল। এমন বিপদে তারা কোন দিন পড়েনি, উপরন্ত তাদের কয়েকজন ছিল নতুন, ওদের পক্ষে এটা ছিল প্রথম লড়াই। তাদের সকলের মুখে এক কথা, আজ আমাদের আর রক্ষা নেই। লড়াই করলে তো মরব, পালিয়ে গেলেও মরব। তখন কামাল বলল, সবাই মরব কেন? এই মেশিনগান আর তোমাদের গুলির বাক্স আমার কাছে রেখে যাও। ওরা যাতে তোমাদের পিছু না ধরে সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। যাও, তোমরা চলে যাও। কামাল একটা গর্তের ভিতরে শুয়ে পড়ল। এবার তার পাশে আর কেউ নেই। সেখান থেকে চারদিকে গুলি ছুঁড়তে লাগল। আর চারদিক থেকে গুলি আসতে লাগল। হাজার হাজার গুলি। যতক্ষন তার কাছে গুলি রইল ততক্ষন কামাল শত্রুদের মনোযোগ তার দিকে আকর্ষন করতে লাগল।

তারপর এক সময় তার মেশিন গানটার শব্দ থেমে গেল। তখন শত্রুরা খুব সাবধানে এসে দেখল সেই গর্তের মধ্যে শধু একটি যুবকের ক্ষত বিক্ষত দেহ। তার নাম মোস্তফা কামাল।

৫৪৮। একটি মাত্র সুযোগ

কোন এক দিন একটা মানুষকে বাঁচানার সুযোগ হাতে আসে, কিন্তু এক মিনিটের বেশী থাকে না। ফসকে গেলেই আর কোন উপায় নেই। এক দিন আমার হাতে সেই সুযোগ এল।

আমি কলেজে বাংলা পড়াই, আমাদের ভাষার লেখকদের বই ও জীবনের কথা বলতে বলতে আমার উৎসাহ বাড়ে, তখন ছাত্রদের চোখে যদি কোন উত্তর না পাই আমি সাহস হারিয়ে ফেলি, আমার পাঠদানে কোন প্রান থাকে না।

খালেদা সারা বছর ক্লাসের তৃতীয় সারিতেই বসত। মেয়েটা দেখতে সাধারন, পরের চোখ আকর্ষন করার মত তার কিছু নেই, কিন্তু তার মুখে-চোখে কৌতুহলের অন্ত নেই। সে আমার প্রত্যেক কথা আগ্রহ করে শুনত, প্রত্যেক কৌতুকে হাসত, দুঃখের কথা শুনলে চোখের পানি ফেলত। আজ কিন্তু তার মুখ কালো, আমি যাই বলি না কেন তাতে , হাসি, কান্না, আনন্দ ও রাগের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তাই আমার বক্তৃতায় কোন প্রান ছিল না। আমার মাথা ধরছিল, আমি দশ মিনিট আগে ছুটি দিলাম। তখন হঠাৎ ভাবলাম, এই মেয়ের কাছ থেকে আমি কত পেয়েছি... আর তাকে আমি কি দিয়েছি?... আরও ভাবলাম, তার অবস্থা স্বাভাবিক নয়... কোথায় গেল সে?... তার বান্ধবী মরিয়ম চলে যাচ্ছিল, আমি ডাকলাম,

. খালেদার কি হল বলতে পার?

. না স্যার, জিজ্ঞেস করলে কোন উত্তর দেয় না... হয়তো তার অসুখ। এখন তাড়াতাড়ি কি ওষুধ যেন কিনতে গিয়েছে।

. তার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে, তাকে এক্ষনই খবর দিতে হবে। তোমার ছোট ভাইকে কাজে লাগাও, আর তুমি সব জায়গায়

জান? আমার মেয়ে যেন তোমার মত হয়...মা, তোমার বাঁচতে হবে, তুমি পারবে না আমাদের ছেড়ে যেতে! আমরা সবাই তোমাকে ভালবাসি, শুধু তোমাকে বলতে ভুলে গেছি।

. স্যার... আপনি আমাকে ঠকাচ্ছেন। এই সব কথা কি... সত্য?...

. সুর্যের আলোর মত সত্য মা!

. তাহলে কেন আপনারা আমাকে জানতে দিলেন না স্যার? আমার ধারনা, কেউ আমাকে ভালবাসে না, আমার দ্বারা কারও উপকার হচ্ছে না, হবেও না। তাই মরতে চেয়েছিলাম। আপনাদের ভালবাসা আমার কোন্ কাজে লাগে যদি তা জানতে না পারি.........?

এই বলে খালেদা আবার একটা ঝর্ণার মত কাধঁতে লাগল, আর আমি বুঝলাম বিপদ কেটে গেছে। সে আর মরবে না।

তবে সেদিন ভীষন ধাক্কা খেয়েছিলাম। কজন যুবক, যুবতি, ছেলে, মেয়ে, আমার চোখের সামনে দিয়ে যায় আর আমি তাদের চোখ দেখি, দেখে আমার মন জুড়ে যায়, অথচ আমি কিছু বলি না, তাই ওরা আমাকে কত দিচ্ছে তা জানেই না, তারা কত মূল্যবান তাও জানে না। সেদিন আমি পণ করেছি, মানুষের অসীম সৌন্দর্য আমার চোখে পড়লে আমি না দেখার ভান করব না, না দেখার পাপ করব না। আমি চোখ খুলে দেখব, যা ভাল তাকে ভাল বলব, যা সুন্দর তাকে সুন্দর বলব, না দেখে ও না বলে পাশ কাটিয়ে যাব না, কোন দিন না !

আর একটা শিক্ষা পেয়েছিলাম। সময় সময় একটা মানুষকে বাঁচাবার সুযোগ আসে মাত্র এক ঘন্টার জন্য। সেদিন যদি এক ঘন্টা দেরী করতাম খালেদা মারা যেত। আজ থেকে একটা মানুষকে বাঁচাবার সুযোগ আসলে আজকেই বাঁচাব, আগামী কাল নয়। হয় তো সেই আগামী কাল আমার আছে, তার নেই।

৫৫০। নৌকাডুবি

• আমার ছেলে কই? আমার ছেলে কই?

আহম্মদের মা পাগলির মত এদিক ওদিক দৌড়াতে থাকে, সবাইকে ঘর থেকে টেনে বের করে। তারপর আবার আমাকে ধরে জিজ্ঞেস করে, ওর কি হয়েছে বল? আমি আবার বলি, মধুপুর গ্রামে ফুটবল খেলতে গিয়ে ফিরে আসছিলাম। আহম্মদ, সামাদ আর আমি বল খেলতে খেলতে আসছিলাম, তাই পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম। ঘাটে এসে দেখি খেয়া চলে গেছে, আর ফিরছে না। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, তখন ঘাটে একটা নৌকা দেখলাম। খুব ছোট। আমরা তিনজনেই উঠলাম। বৈঠা ছিল না, তিনজনে হাত দিয়ে বাইতে বাইতে নদীর মাঝখান পর্যন্ত এলাম। কিন্তু নৌকার তক্তা পচা ছিল। খুব বেশী পানি উঠছিল। শেষে ডুবে গেল। আমি সাঁতার কম জানি, ভাগ্যিস আমার হাতে বল ছিল। বলটা আঁকড়ে ধরে পাড়ে উঠে আসলাম। তখন রফিক মামা এল হারিকেন নিয়ে। দেখল সামাদের চুল পানিতে ভেসে যাচ্ছে। তাকে ধরে হাসপাতালে নিয়ে গেল, কিন্তু আহম্মদকে পাওয়া গেল না।

আহম্মদের মা সবার পা ধরতে লাগল, ওরে, বাবারে, আমার ছেলেকে বাঁচাও! সবাই নদীতে খুঁজতে লাগল, তিন ঘন্টা ধরে খুঁজল। মা তিন ঘন্টা ধরে কাঁদল। শেষে আহম্মদের বাবা ছেলেটার লাশ নিয়ে নদী

বিহারী। যুদ্ধের সময় সে পাকিস্থানের পক্ষে ছিল, তাই গ্রামের লোকেরা তাকে মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে।

তারা একটা বাঁশের আগায় বাংলাদেশের পতাকা বেধে বাঁশটা তার হাতে দিয়ে গ্রামে গ্রামে তাকে ঘোরাতে লাগল। দিন শেষ হয়ে যাচ্ছিল। তারা আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে গেল। বন্দুক হাতে চারজন লোক তাকে পাহারা দিচ্ছিল। আমার বাবা তাদের বলল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। এখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ওকে ছেড়ে দাও। ও যদি কোন অন্যায় করে থাকে সরকার বিচার করবে। তোমরা ওর বিচার করতে পার না।

তারা উত্তর দিল, এই লোকটি বাঙ্গালীদের মেরেছে, তাকে ছেড়ে দেব

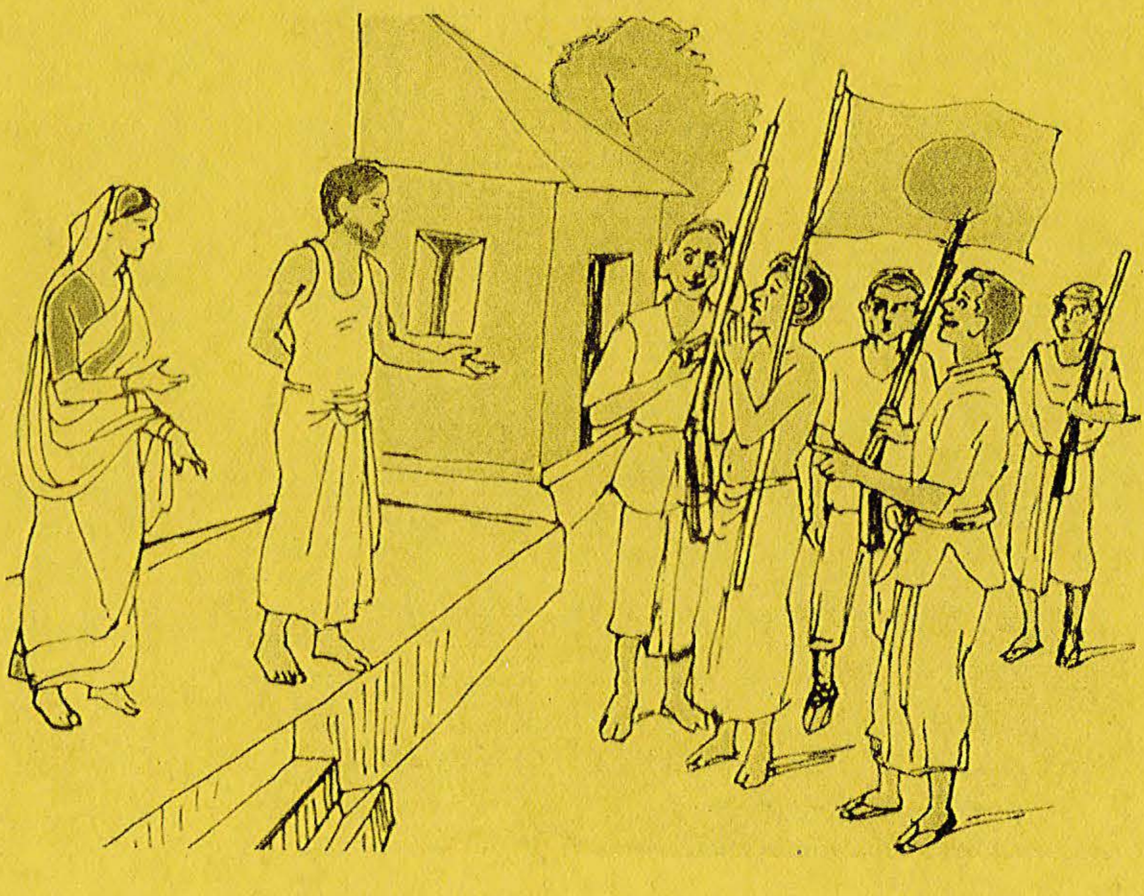

৫৫২। তিলে তাল

বুলি নীলুর মাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, বুবু আমার ছাগলটা দেখেছ? কলিকাল তো, কখন কে জবাই করে খাবে তার ঠিক আছে?
নীলুর মা বুলির ছাগল দেখেনি। পুকুর ঘাটে গিয়ে পেঁচীকে দেখতে পেয়ে তাকে সাবধান করে দিল। তোমার গরু কোথায়? চোরে বুলির ছাগল জবাই করে নিয়েছে, তাহলে গরু চুরি করতে আর কতক্ষণ? আমার গরু হলে কেউ চুরি করতে পারত না। থানা-পুলিশ আছে না?
পেচীঁ এ কথা শুনে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে গেল। বৌকে ডেকে বলল, গরুটা চোখে চোখে রেখ। বুলির ছাগলটা চোরে নিয়ে গেছে। পুলিশ সব বাড়ি বাড়ি দাগী চোর খুঁজে বেড়াচ্ছে। ফজুর এবার আর রক্ষা নেই! মেরে হাড় গুড়ো করে দেবে দেখিস্।
বউ মাঠে গেল গরু আনতে । দেখল, দুলুর মা নিশ্চিন্ত মনে পুকুরে যাচ্ছে। বলল, বুবু শোন, এই গোলমালের ভিতর তোমার কিন্তু ঘর থেকে বের হওয়া উচিৎ হয়নি। জান না, পুলিশ বুলির গরু খুঁজে বেড়াচ্ছে? ফজু এখনও বেঁচে আছে কিনা কে জানে? ওকে যা মেরেছে ! এই অবস্থায় তুমি ঘরের বউ বাইরে আছ? শিগ্গি ঘরে ফিরে যাও। দুলুর মা ঘোমটা আর একটু টেনে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। শ্বাশুড়ীকে বলল, মা, দরজা

মুখ দেখেছি, ওদের ছেলেমেয়েদের হাসি দেখেছি, আমি ওদের ভাষা জানি, ওদের কথা শুনেছি। সেনাপতি, ওরা শুধু আমার শত্রু ছিল না, ওরা ছিল আমার মত মানুষ। একটা চেনা মানুষের বুকে তলোয়ার চালাতে তুমি পার, আমি পারি না।

মহারাজ, যারা মারা গেছে তারা কাফের, হারামী।

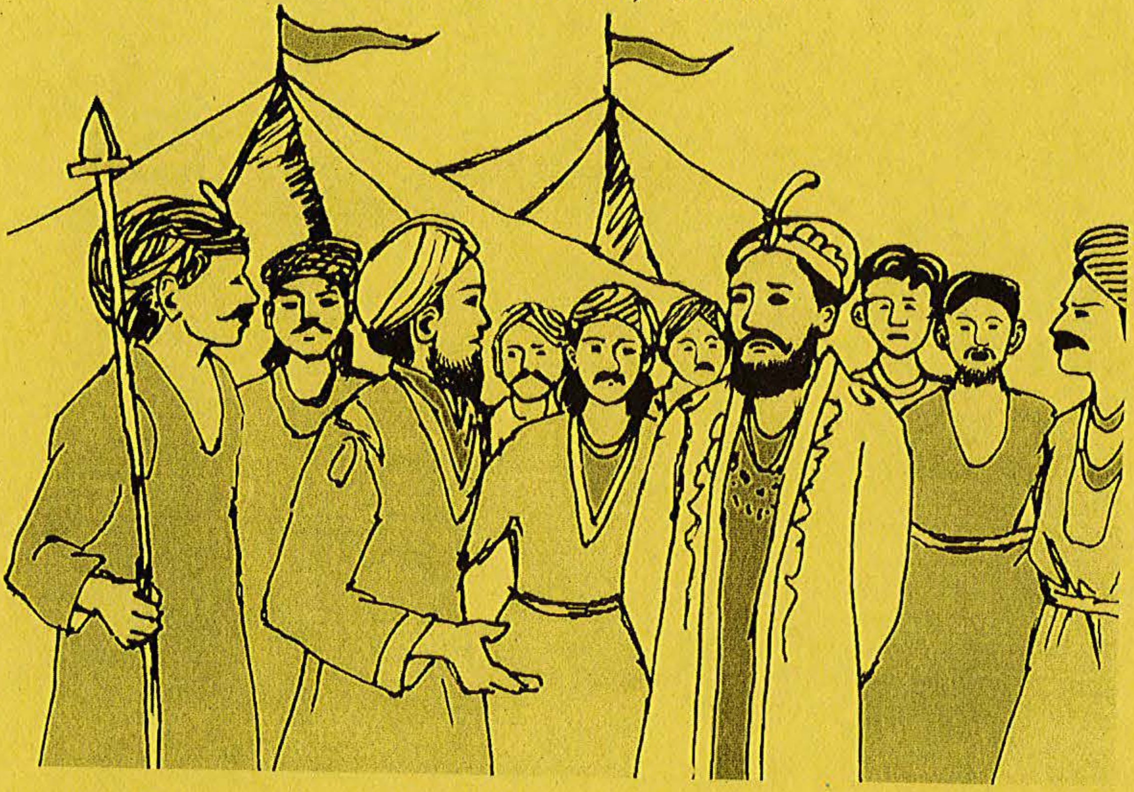

সম্রাট বললেন, সেনাপতি, ওরা আল্লার সৃষ্ট মানুষ। আজ ওদের জন্য আল্লাহ কাঁদে। আমি কি আনন্দ করতে পারি?

৫৫৪। বাপ, বেটা ও গাধা

এক ছিল চাষী ও তার দশ বছরের একটি ছেলে। একদিন দু'জনে তাদের গাধাটি নিয়ে বাজারে গেল। পথে দু'জন লোক বসা ছিল। তারা

৫৫৫। মায়ের চোখ

ভোর হল। মামুদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। অনেক দিন বর্ষা হয়েছে। আজ বাতাস এসে মেঘ তাড়িয়ে দিয়েছে। আকাশ পরিস্কার হয়ে গেছে, সূর্য্য এসে গেছে। মামুদ ভাবল, কি মজা! আজ সারা দিন মাঠে ঘুরে বেড়াব, সারা দিন বাবুলের সঙ্গে ঘুড়ি উড়াব! না, এমন দিন নষ্ট করা যাবে না!

তাই তো... কিন্তু স্কুল?... মা কি বলবে? বাবুলের মা কি বলবে? স্যার কি বলবে? ওরা তো ঘুড়ি উড়ায় না, ওরা জানে না আজকের দিন ঘুড়ি উড়াবার দিন, এমন দিন বছরে এক বার আসে, তারপরে আর আসে না, স্কুলে যেকোন দিন যাওয়া যায়, কিন্তু ঘুড়ি উড়াতে হলে আজকেই উড়াতে হয়!...

মামুদ কি করবে তা ঠিক করতে পারছে না। এত সুন্দর আকাশ বাতাস! আর ঘুড়িটা বিছানার পাশে যেন তার কানে কানে বলছে, আমাকে নিয়ে মাঠে চল। স্কুলে যাবে কালকে...

ঠিক সেই সময় মা এল, হাতে একটা থালা। বলল, দেখ বাবা, তোমার জন্য পরাটা তৈরী করেছি। তার ভিতরে চিনিও দিয়েছি, দেখবে কি মজা!

মামুদের চোখ উজ্জল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়াল। মা

বলল, এই তো দিচ্ছি, হাত মুখ ধুয়ে এস। কিন্তু আগে একটা

- কথা দিতে হবে বাবা। পারবে?
- কি কথা দিতে হবে? দেখি, পারি কি না?
- স্কুলে যাবার সময় ঘুড়িটা রেখে যাবে, বাবুলকেও ঘুড়ি নিতে নিষেধ করবে। স্কুল থেকে ফিরে এসে খেলবে।

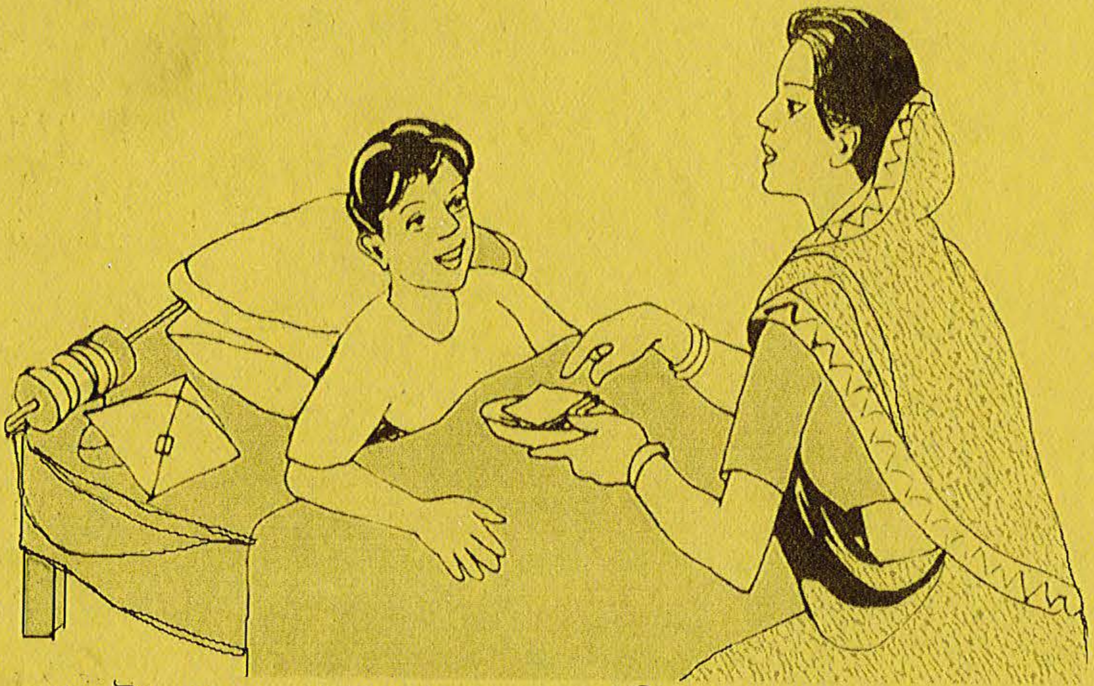

পরাটা খেতে খেতে মামুদ মায়ের দিকে তাকায়। কেমন করে মা তার মনের কথা বুঝতে পেরেছে?... আসলে মা ঘুড়ির কথা ভাল করে বোঝে। কি করে শিখল? ও তো একটা মেয়ে, মেয়েরা ঘুড়ি উড়ায় না... তার মনের কথা জানল কেমন করে?...

৫৫৬। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা

তপন ঘুম থেকে উঠল। আড়মোড়া ভেঙ্গে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বের হল। বারান্দার খুটিটা দেখতে পেল না। খুব জোরে খুটির সঙ্গে গুতো খেল।

তপন কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে উঠানে নেমে গেল। সিড়িতে বিড়ালটা শুয়ে ছিল। তপনের পা পড়ল ঠিক তার লেজের উপর। বিড়াল ম্যাঁও করে তার পায়ে আছড় মারল। তপন ভাবল, কেন, আমার কি দোষ? বাড়িতে এত জায়গা থাকতে, সে এখানে শুতে এল কেন? এই দুনিয়ায় কোন বিচার নেই! তপনের কান্না বেড়ে গেল। তার দু'চোখ পানিতে ভরে গেল। সেজন্যই তো কলার খোসাটা দেখতে পেল না। তার উপড় পা পড়তেই পিছলে পড়ে গেল। উঠানটা কি শক্ত! এবার তপন আর সহ্য করতে পারল না। রাগে দুঃখে সেখানে চিৎ হয়ে পড়ে থাকল আর তার চোখের সমস্ত পানি ফেলতে লাগল। কি দোষ করেছে সে? তার উপরে এত অত্যাচার কেন?........ সঙ্গে সঙ্গে মা

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। বলল, এস বাবা, দেখে যাও তোমার জন্য কি তৈরী করেছি! চোখের পলকে তার সব দুঃখ ও ব্যাথা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তপন রান্নাঘরে গিয়ে দই খেল। খেতে খেতে তার চোখের পানি শুকিয়ে গেল। দরজার বাইরে চেয়ে দেখল, আলম তার খেলার সাথী উঠানে এসে হাজির। বলল, মা দইটা খুব মজা... আর... আমি আলমের সঙ্গে একটু খেলা করে আসি।

৫৫৭। হরিণ আর বাঘ

একটা হরিণের বাচ্চা নদীতে পানি খাচ্ছিল। বাঘ তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলঃ- তুই কেন আমার খাওয়ার পানি ঘোলা করে দিলি?

- আমি না, হুজুর, পানি তো আমার দিকে বেয়ে আসছে।
- তুই কিন্তু ছয় মাস আগে আমাকে মন্দ বলেছিলি, মনে নেই?
- তা হয় কি করে হুজুর, আমার বয়স এখনও তিন মাস হয়নি।

- তাহলে তোর ভাই বলেছে, কোন সন্দেহ নেই!
- মানে... আমার কোন ভাই নেই হুজুর।
- সে কি! আমার সঙ্গে তর্ক! তোর এত বড় সাহস!

এই বলে বাঘটা হরিণের বাচ্চার উপর ঝাপিয়ে পড়ল ও তাকে গ্রাস করে ফেলল।

৫৫৮। দুই বোন

দুই বোন এক বছরের ছোট বড়। কে বড় আর কে ছোট তা বোঝা যায় না। তাই সালমা ছোট বোন ডলিকে আদর করে না আর ডলিও সালমাকে বুবু বলে ডাকে না। এই নিয়ে প্রতিদিন তাদের মধ্যে ঝগড়া বাধে। ডলি শুরু করে।

"আম্মা, তুমি সালমাকে থালা বাসন মাজতে বল।

"আম্মা, ডলিকে আমাকে বুবু বলে ডাকতে বল।

"থালা বাসন না মাজলে আমি ওকে বুবু বলতে পারব না।

"আমি সকালে থালা বাসন মেজেছি, এবার তোমার পালা, আর তুমি তো ছোট, আমার কথা তোমার মানতে হবে।

"না, সবাই বলে আমরা দু'জনে সমান সমান। আর লেখাপড়ায় আমি তোমার চেয়ে ভাল। তাই না আম্মা?

অবশেষে মা বিচার করতে বাধ্য হয়।

"ডলি, থালা বাসন মাজতে যাও, আজ তোমার পালা। সালমা, তুমি বড় হাড়িটা নিয়ে ছোট বোনকে সাহায্য কর... আর ডলি, তুমি সালমাকে বুবু বলে ডাক।

ডলি এবার সালমার হাত ধরে বলে, চল বুবু, আমাকে সাহায্য কর, আর আমি সারাটা দিন তোমাকে বুবু বলে ডাকব।

এবার সালমা হাসে। দু'জনে মিলে থালা মাজতে যায়।

৫৫৯। মা আর পারছে না

- মা ভাত দাও।
- এই যে বাবা, দিচ্ছি।
- মা তরকারি দাও।
- এই যে মা, দিচ্ছি।
- মা একটু লবন দাও।
- এই যে বাবা, নাও।
- মা আমরা একটা গল্প শুনব।
- এখন না বাবা, পরে শুনাব।
- না, পরে না, এখন বল।
- তোমরা তিনজন একটু চুপ কর দেখি... কান পেতে শোন... থালা বাসন কথা বলছে, শুনতে পাচ্ছ না? ওরা বলছে, আমাদের মেজে রেখে দাও। আর শোন বারান্দাও কথা বলছে। বলছে, আমাকে লেপে দাও, আর ঐ পাশে কাপড় চোপড় কি বলছে শুনছ? আমাদের কেঁচে দাও, সেলাই করে দাও... কি, শুনতে পাচ্ছ না? কানের পর্দা ছিড়ে যাচ্ছে যে! তোমরা শুনতে পাচ্ছ না কেন?....

এবার কিন্তু আমেনা বুঝতে পারল। খাওয়া দাওয়া সেরে ফাতেমার হাত ধরে বলল, চল বুবু, আজ আমরা বারান্দা লেপব।

৫৬০। কেউ জানে না...

আমার ছোট ভাইয়ের বয়স ছিল পাঁচ বছর । একদিন আমরা দু'জন বাসে চড়ে বুবুর বাড়ি যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কি যে ঘটল তা বুঝতে পারলাম না, সব কিছু যেন উল্টে যাচ্ছিল। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। যখন আমার হুস ফিরে এল, তখন সবাই কাঁদছিল। পাশে আমার ছোট ভাই শুয়ে ছিল। কিন্তু সে নড়ছিল না। আর কোনদিন সে নড়বেও না। মারা গিয়েছিল।

কাঁদতে কাঁদতে মায়ের চোখের পানি ফুরিয়ে গেছে। পড়শীরা আসে তাকে সান্তনা দেওার জন্য। বলে, সবই আল্লার ইচ্ছা। মা চুপ করে থাকে, কোন কথা বলে না।

আমি জিজ্ঞেস করি, মা ছোটরা কেন মরে?

মা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

শেষে বলে, জানি না বাবা।

"ছোট ভাইয়ার কি দোষ ছিল মা?

"কোন দোষ ছিল না বাবা।

"ও আমার ছোট, কেন আল্লা ওকে নিয়ে গেছে মা? আমাকে না নিয়ে ওকে নিল কেন মা? মা এবার আমাকে জড়িয়ে ধরল। কেঁদে কেঁদে বলল, জানি না বাবা... কেউ জানে না।

৫৬১। হিন্দু আর মুসলমান

স্যার বলল যে, ভারতে হিন্দুরা মুসলমানদের একটা মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে মুসলমানরা একটা হিন্দু গ্রাম পুড়িয়ে দিল।

বাড়ি যাওয়ার পথে আমি বিমলকে বললাম, তোমরা তো হিন্দু, তোমরাই খারাপ। তোমরা আমাদের মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছ।

"তোমরাই খারাপ, তোমরা আমাদের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছ।

"কই আমি তো কারও বাড়ি-ঘর পুড়াইনি।

"আমিও মসজিদ পুড়াইনি।

"কিন্তু... ওরা এসব করে কেন বলতে পার?

আব্বা আমাদের কথা শুনেছিল। বলল, আমি আগে ঐ দেশে বাস করতাম, এখন এই দেশে বাস করছি। ভারতে হিন্দুদের জোর বেশী তাই ওরা ওখানে জোর খাটায়।

এই দেশে মুসলমানদের জোর বেশী, তাই আমরাই জোর খাটাই।

"তাহলে এখন কি হবে?

"এখন বোকামিটা শেষ হয়ে যাবে। ওরা আমাদের মসজিদ মেরামত করবে আর আমরা ওদের বাড়িঘর তৈরী করে দেব। ওরা বলবে, মাপ করে দাও ভাই, আমরা বোকার মত কাজ করেছি। আমরাও তাই বলব।

এক দিন স্কুলে এল এক ভদ্র লোক। তার মুখ ছাত্ররা কোথায় যেন দেখেছিল। আপা তাকে সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারে বসতে দিল।

. সালাম আপা, কেমন আছেন?

. ভাল, কেন এতদিন মুখ দেখাওনি?

. আমি আসিনি বটে তবে আমি মুখ দেখাইনি, এমন কথা বলতে পারেন না। এই বছরে কম পক্ষে পঞ্চাশ বার সবাইকে আমার মুখ দেখালাম... ছেলেমেয়েরা, তোমরা এই বছরে আমাকে কয় বার দেখেছ বল তো?

. অনেক বার! প্রত্যেক শুক্রুবার!... আপনি টিভিতে গল্প বলেন যে!

. আপা, শুনলেন তো!... আচ্ছা ছেলেমেয়েরো, এক দিন আমি এই স্কুলে পড়তাম, তারপর দূরে চলে গেলাম, আর এখন আমার গ্রামের লোকেরা আমাকে চেয়ারম্যান করে নিয়েছে। তাই আমি গ্রামে ফিরে এলাম। কি করতে পারি তোমাদের জন্য?

. স্যার, একটা গল্প বলুন!

. বেশ, তাহলে শোন। এক ছেলে ছিল, নাম তার নুর আলম, তবে সবাই তাকে আলু বলে ডাকত। আলু অন্যান্য ভদ্র ছেলেদের মত ছিল না, সে গাছে উঠে লিচু আম চুরি করত, জামা প্যান্ট ছিড়ে ফেলত, ইংরেজী জানত না, তার হাতের লেখা বিশ্রী, তার উপরে আবার স্কুল কামাই করত... আপা নিরাশ হয়ে গিয়েছিল, তাকে তিরস্কার করত, সামান্য উন্নতি দেখলে প্রশংসা করত, কিন্তু সময় সময় প্রশংসা করার মত কিছু খুঁজে পেত না।

এক দিন কিনতু এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। আপা স্কুল থেকে বাড়ি

এক দিন আপা বলল, আলম, তুমি যে ভাবে গল্প বল, সেই ভাবে লিখতে পারলে সব ছেলেমেয়েরা তোমার গল্প পড়তে চাবে। তুমি সেই ভাবে গল্প লিখতে শুরু কর। যত খাতা লাগবে আমি দেব। নূর আলম যখন গল্পের বই লিখতে শুরু করল তখন তার বয়স দশ বছর ছিল। পনের বছর বয়সে তার প্রথম বই ছাপাল, তারপর শহরে চলে গেল এবং প্রতি বছর একটা করে বই ছাপাতে লাগল। এক দিন টি-ভি এর পরিচালক, তার বই পড়ে প্রতি শুক্রুবারে চারটের সময় টি-ভি তে ছেলেমেয়েদের গল্প শুনাতে অনুরোধ করল। তারপর এক দিন নূর আলম তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে গ্রামে ফিরে এল আর গ্রামের লোকেরা তাকে চেয়ারম্যান বানাল কারণ তাদের মনে পড়ে গেল যে বাজার করতে গিয়ে সে টাকা ফিরিয়ে দিত যখন দোকানদার ভূল হিসাব করত, তাই সবাই মনে করল সে সৎ চেয়ারম্যান হবে, দশের টাকা চুরি করবে না। আজকে সে তার স্কুলে আপার সঙ্গে দেখা করতে এল, কিনতু এখন তার প্যান্ট আগের মত ছেড়া নয় ও তার মাথার চুল এলোমেলো নয়, এমন কি তার গলায় একটা টাই বাধা আছে।

• আচ্ছা, আমার গল্প কেমন লাগল?

• খুব ভাল, কিন্তু আপা একশ বার তোমার এই গল্প বলেছে...
আমাদের যখন বই পড়ার ইচ্ছা নেই তখন তোমার গল্প বলে...
আর যখন স্কুলে আসার পথে থেমে যাই মার্বেল খেলতে...
আর যদি লিচু চুরি করে খাই, তখন বলে...

আপা বলে, ছোটবেলায় সবাই দুষ্টুমি করে, কিনতু পরে প্রায় সকলে ভাল হয়ে যায়, তোমার মত।

৫৬৩। প্রতিধ্বনী

আলম ও রুনা যশোর ছেড়ে সিলেট চলে যাচ্ছে। বাবা সরকারী চাকরী করে, পাঁচ বছর পর পর তার বদলী হয়। খবরটা শুনে আলম নেচে উঠেছে। এতদিন পরে ঐ পঁচা স্কুল ছেড়ে দেবে আর ঐ সব অভদ্র ছেলেমেয়ের সাথে তাকে আর মিশতে হবে না। এদিকে রুনা খুব আফসোস করছে। ক্লাস থ্রীর ছেলেমেয়েরা নাকি খুব ভদ্র, তার অনেক বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক তাকে খুব ভালবাসে, তার চলে যাওয়ার কথা শুনে খুব দুঃখ করেছে। তবু যেতে হচ্ছে। সৌভাগ্য এই যে সিলেটে তাদের মামার বাড়ি। নতুন বাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মামা, নানা, নানী দেখা করতে আসে। আলম ও রুনাকে দেখে বলে, তারা না কি খুব বড় হয়ে গেছে ও তাদের মত সুন্দর ছেলেমেয়ে সারা টাউনে আর নেই। আলম জিজ্ঞাসা করল, এখানকার স্কুলের ছেলেমেয়েরা কেমন? আর স্যারেরা কেমন? নানা বলল, যশোরে কেমন দেখলে? আলম বলল, ছেলেমেয়েরা অভদ্র, ঝগড়াটে। আর স্যারেরা তো...

কেউ ভাল না! নানার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। বলল, এখানকার ছেলেমেয়েরাও মোটামুটি ঐ রকম। ঠিক সেই সময় রুনা আসল। রুনা সেই একই প্রশ্ন করে বসল, নানা, এখানকার আপারা ও ছেলেমেয়েরা কেমন? নানাও সেই একই প্রশ্ন করল, যশোরে কেমন দেখলে? রুনা বলল, ছেলেমেয়েরা খুব ভদ্র, আর আপারা আমাদের খুব ভালবাসত, ওদের ছেড়ে আসতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। নানা বলল, দুঃখ কর না

নানাভাই, এখানকার স্যারেরা ও ছেলেমেয়েরা সেই রকমই। নানার দুই রকম কথা শুনে আলম আশ্চর্য হল। রাত্রে খাবার সময় মাকে বলল, নানা কিনতু মিথ্যাকথা বলে। আমাকে যা বলল রুনাকে বলেছে তার উল্টো! মা বলল, তোমার নানা মিথ্যাকথা বলে না। এক দিন বুঝবে।

পরের সপ্তা সবাই মিলে পাহাড়ে বনভোজন করতে গেল। মা বলল, এস তোমাদের একটা মজার জায়গা দেখাচ্ছি। এই পাথরের খনিতে আমি ছোটবেলায় আসতাম। ঐ পাহাড়ের গায়ে একটা ছেলে ও একটা মেয়ে লুকানো আছে। তোমরা কথা বললে ওরা উত্তর দেবে। সঙ্গে সঙ্গে আলম শুরু করল, হ্যালো, তোমার নাম কি? ও পাশ থেকে উত্তর এল, হ্যালো, তোমার নাম কি? আলম জোর দিয়ে বলল, আগে তুমি বল! উত্তর এল, আগে তুমি বল! আলম রাগ করে বলল, বোকা কোথাকার! ওপাশ থেকে উত্তর এল, বোকা কোথাকার!

এবার রুনা বলল, দেখি মেয়েটা কেমন। হ্যালো! একটা চিকন সুর উত্তর দিল, হ্যালো! রুনা বলল, আমার নাম রুনা। উত্তর এল, আমার নাম রুনা। রুনা খিল খিল করে হাসল। মেয়েটাও খিল খিল করে হাসল। রুনা বলল, আমার কাছে আসবে? আমি পারি না। মেয়েটা উত্তর দিল, আমি পারি না। রুনা বলল, তাহলে গুড বাই! মেয়েটা উত্তর দিল, তাহলে গুড বাই! এবার রুনা তার ভাইএর দিকে চেয়ে বললঃ- কই, মেয়েটা খুব ভদ্র!... সবাই হাসল।

ফিরে আসার পথে মা আলমকে বলল, এবার বুঝলে তোমার নানার কথা? চিমটি কাটলে ঘুষি খেতে হয়। ভদ্র ব্যবহার কর, পাহাড় পর্যন্ত তোমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবে। তুমি যা দেবে ঠিক তাই পেয়ে যাবে।

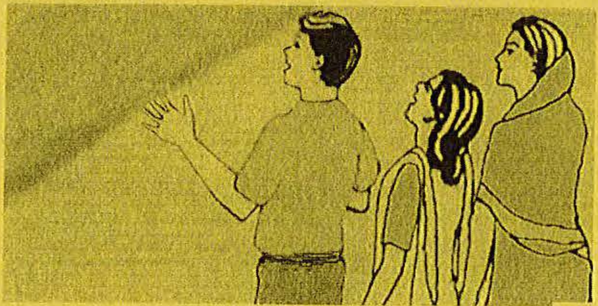

রাবেয়া, রিপা, মিজান, মীনা, খেলু, রকি, দশ-বার বছর বয়সে বড় লোকের বাড়িতে কাজ করে। তারা কাজের মেয়ে বা কাজের ছেলে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি যাবার পথে অন্যদের সঙ্গে দেখা হয়। সেদিন...

. রাবেয়া - তোমার মুখ কালো কেন রিপা? তুমি তো বড় লোকের বাড়িতে কাজ কর, তোমার রান্না বান্না আর কাপড় কাঁচা ছাড়া কোন কাজ নেই, তার উপর দু' বেলা খাওয়া!

. রিপা - তুমি বুঝবে না। সারা বছর রান্নাঘর আর পুকুরে থালা বাসন মাজা ও ময়লা কাপড় কাচা, এ ছাড়া কিছু দেখি না, করি না, জানি না। আমি মরেই বেঁচে আছি, দেখতে পাচ্ছ না?

. মিজান - তুমি আর কি চাও? তুমি তো মেয়ে। রান্না করা আর শিশুদের দেখাশুনা ছাড়া তোমার আর কিছু করতে হবে না।

. রিপা - কি চাই! আমি জানতে চাই, পৃথিবী দেখতে চাই, বই পড়তে চাই, স্কুলে যেতে চাই, মানুষ হতে চাই!

. মিজান - ইস... মেয়েদের আবার লেখাপড়া! তোমার বাজার করতে হয় না, হিসাব করতে হয় না, লেখা-লেখি করতে হয় না, তুমি রান্না করবে আর খাবে!

. রিপা - তুমি ঘোড়ার ডিম বোঝ! শিশুদের তৈরী করতে, খেতে দিতে, যত্ন নিতে, মানুষ করতে, এই জন্য বেশী বুদ্ধি লাগে, না খোয়া ভাংতে ও রিক্সা টানতে বেশী বুদ্ধি লাগে? তোমরা কি বল?

. মীনা - রিপার কথা ঠিক! আমরাও মানুষ হতে চাই। আমরাও বই পড়তে চাই। একটা বই লিখতে এক জ্ঞানী মানুষের সারা জীবন লাগে, আর আমরা এক দিনে তার বুদ্ধি পেয়ে যাই। মানুষ হতে গেলে বই পড়া দরকার।

. খেলা করতে চাই।

. কাজের সময় বা পড়ার সময় যদি কেউ মারে, কত জরিমানা দেবে?

. এক এক ঘায়ের জন্য... একশ টাকা।

. মীনা - বেশ, তাহলে আমি জাতীয় পরিষদে গিয়ে এই ভাষন দেব, ভাই সব, আমার পার্টি হল ছেলেমেয়েদের পার্টি। আমি লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের নামে কথা বলছি। আমরা এই আইন পাশ করাতে চাই, আজ থেকে ছেলেমেয়েরা তিন ঘন্টা কাজ করবে, আর তারা তিন ঘন্টা গল্পের বই পড়বে। বাকি সময় তারা খেলা করবে। কেউ যদি তাদের মারে তবে এক এক ঘায়ের জন্য একশ টাকা জরিমানা দেবে । আর পাঁচ বছর পর যখন রিপার বিয়ে হবে আর আমার বিয়ে হবে, তখন যদি কোন স্বামী তার বউকে মারে, তার হবে যাবতজীবন কারাদন্ড আর না হয় তিন ঘন্টা ফাঁসি। আচ্ছা এই আইনটা কেমন লাগল?

. খুব ভাল! মীনা আপার কি?... জয়! মীনা আপার কি?... জয়!

৫৬৫। খয়রাত

আমেনার নানা মসজিদের ইমাম। তার তিন বিঘা জমি আছে। নিজের হাতে চাষাবাদ করে। গ্রামের লোকেরা তাকে এক হাজার টাকা মাইনে দেয়। সবাই বলে, উনি খুব পরহেজগার লোক।

এক দিন সে আমেনাদের বাড়ী গেল। দুপুরে সবাই খেতে বসেছে। এমন সময় কানা বুড়ি এলো। মা

৫৬৬। নাতনীর হাতের ছাপ

মীনার বাবা যখন গ্রাম ছেড়ে টাউনে কাজ করতে গেল, তখন মীনার বয়স দশ বছর। ছয় মাস তার খুব কষ্টে কাটল। তারপর একদিন বাবা ফিরে এসে মীনার মাকে বলল, চল, আমরা এবার ছেলেমেয়েদের নিয়ে টাউনে চলে যাই। দু' দিন পর যদি বড় ঘর পাই তাহলে বাবা-মাকে নিয়ে যাব।

যাবার সময় ছেলেমেয়ে তিনজনই খুব কাঁদল। দাদা-দাদীকে ছেড়ে যেতে চাচ্ছিল না। বাবা বলল, কিছু দিন যাক, তারপর ওরা আমাদের সঙ্গে টাউনে আসবে।

দাদা কিন্তু কোনদিন টাউনে যেতে পারল না। তিন মাস পর একদিন বিছানা থেকে উঠল না। মরার তিনদিন আগে দাদীকে একটা কথা বলেছিল, আমরা বেঁচে আছি কি জন্য? তাতে দাদী মনে মনে ভয় পেয়েছিল।

দাদাকে কবর দেওয়ার জন্য সবাই আসল, মীনার বাবা মা, ভাইয়েরা, চাচী ও চাচাত ভাইবোনেরা, সবাই। তারপর এক এক করে সবাই চলে গেল। মীনা ও তার মা দু'দিন থেকে গেল। তারা ঘর ও উঠান সুন্দর করে লেপে দিল। ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে দিল। এবারও তার অভ্যাস মত সমস্ত কাজ শেষ করে, মীনা পানের কৌটা থেকে কিছুটা চুন নিল, পানিতে চুন গুলিয়ে হাতে লাগাল। তাই দিয়ে দরজার পাশে নতুন লেপা দেয়ালের গায়ে হাসতে হাসতে তার হাতের ছাপ মেরে দিল। তার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এই দুষ্টুমি সে করবেই। দাদী তিন চারবার বকবে, তারপর মীনা মুছে ফেলবে। এবার কিন্তু দাদী বকল না। মীনা মুছতে ভুলে গেল। পরের দিন রওনা হবার আগে তার

প্রতিটি ঢেলায় পড়েছে আমাদের মাথার ঘাম এই চল্লিশ বছর ধরে। আর ঐ যে রান্না ঘরটি দেখছ, সেখানে আমি চল্লিশ বছর ধরে কত কাজ করেছি, কত হেসেছি, আর কত কেঁদেছি। কারণ, জীবন সব সময় সহজ ছিল না বাবা...। এবার বোঝ। আমাকে এখান থেকে নিয়ে গেলে আমার অর্ধেকও তুমি পাবে না। বাকি অর্ধেক এখানে থেকে যাবে।

বাবা আর কিছু বলল না। সবাই রওনা হবার আয়োজন করতে লাগল।

মীনা দাদীর সব কথা শুনেছিল। এখন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল চুন মাখানো সেই হাতের ছাপ। এক মাস গেল, কেউ মুছেনি। হঠাৎ সে বলল, মা, বাবাকে বল, আমি টাউনে যাব না। দাদীর সঙ্গে থাকব।

৫৬৭। ভিক্ষা ও কাজ

মহানবী যুদ্ধের পরে মদীনার দিকে ফিরছিলেন। দশজন মুজাহিদ রান্নার আয়োজন করছিল। এমন সময় এল একজন ভিক্ষুক। জিজ্ঞেসা করল, নবীজী কোথায় ? তারা বলল, কাঠ কুড়াতে গেছেন। ভিক্ষুক বনের দিকে হেঁটে গেল। মহানবীকে পেয়ে বলল, হুজুর, আপনার বোঝা আমার ঘাড়ে দিন, আপনি এ কাজ করছেন কেন?

- করব না কেন ? কোন কাজে আমার লজ্জা নেই। তুমি কি কর?
- আমি হুজুর... ভিক্ষা করতে এলাম। আমি... কোন কাজ করি না।
- তা কি করে হয়? কাজ না করা তো পাপ।

৫৬৮। নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ

রেজার গ্রাম থেকে চিঠি এল। বাবা লিখেছে, তোমার বড় ভাই কলেরায় মারা গেছে। চিকিৎসার জন্য আমাদের জমি বেচতে চেয়েছিলাম, তোমার ভাই বেচতে দেয়নি। এখন তোমার বিবেকে যা বলে তাই কর। রেজা গ্রামে ফিরে এল। বাবা বুড়ো হয়ে গেছে। বেঁচে থাকার জন্য যদি এখন তার জমি বেঁচতে হয়, সে মনে করবে তার মরা ছেলেকে বেচে খাচ্ছে।

রেজা দশ বছর কষ্ট করে টাউনে থেকেছে। সেখানে তার দু'জন ছেলেমেয়ে হয়েছে। থাকার জায়গা এত কম যে, ঘরে ঢুকতেই দম বন্ধ হয়ে যেত। গ্রামে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

পরের দিন বাবার সঙ্গে একবার গ্রাম ঘুরে এল। এত চেনা মুখ। নিজের লোকের মধ্যে থাকা যে কত বড় আনন্দ, তা সে ভুলে গিয়েছিল। গ্রামের মাঝে বড় পুকুর। পাঁচ বছর আগে মৎস বিভাগ থেকে টাকা

পরিষ্কার। আমি নিয়ে আসি, দাড়াও।
রেজা বউকে ডেকে বলল, একটু দেরী কর, আধঘন্টার মধ্যে কল সারা হয়ে যাবে। বলে সাইকেল চড়ে বাজারে গেল। বজলু মিস্ত্রীর সঙ্গে সে এক ক্লাসে পড়েছিল। এক সময় ওর সঙ্গে তার খুব ভাব ছিল।
বজলু তাকে দেখে খুব খুশি হল। চা খাওয়াতে যাচ্ছিল, রেজা বলল, না ভাই, চা তুমি খাবে আমাদের বাড়ীতে। এক্ষুণি এস, টিউবওয়েল সারাবার জন্য যা লাগে তাই কিনে আন, খরচ আমার।
কল সারতে বজলুর পনের মিনিট লাগল। পানি যখন আবার বের হতে লাগল, তখন চারিদিকের সমস্ত বউরা এসে বলতে লাগল,
• যাক, পুরুষদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটা ঠান্ডা মাথা পাওয়া গেল। আমাদের কষ্ট কেউ দেখেনি। আর ভাতের সঙ্গে কত পায়খানা খেয়েছে, তার কোন ঠিক আছে?
রেজার বিশ টাকা খরচ হয়েছিল। পরেরদিন ভজার বৌ বিশ টাকা রেজার বউকে দিয়ে গেল। বলল, স্বামীদের কান্ডজ্ঞান নেই বটে, তবে আমাদের শরম আছে। নাও, আমি বউদের কাছ থেকে চাঁদা তুলেছি।

৫৬৯। শহীদ...?

আব্দুল যুদ্ধে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। মা ঘরে বসে কাঁদছে।
• আব্দুল- জন্মভূমির জন্য শহীদ হলে আমি অমর হয়ে থাকব, আর তোমাকে সবাই বীরের জননী বলে ডাকবে।
• মা- জন্মভূমি মানে কি রে খোকা? তুইতো এই গ্রামে জন্মেছিস। এই গ্রাম তো কেউ উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না।
• আব্দুল- বাঙ্গালী জাতি জেগেছে। তারা আর দাস হয়ে থাকবে না। স্বাধীন হবার জন্য আমরা বুকের রক্ত দিতে রাজি।

৫৭০। বুবুর খুঁজে

মাসুম তার মাকে দেখেনি। মা যখন মারা গেল, তখন তার দু'বছর বয়স। সে মানুষ হয়েছে তার বুবুর কোলে। যখন বুবুর বিয়ে হল, তখন তার বয়স আট বছর। বুবুকে সে ছাড়তে চাচ্ছিল না। রীণাও তাকে ছাড়তে পারছিল না।

বাবা যৌতুকের টাকা জোগাড় করতে পারে নি। ষোল বছর বয়সে রীণাকে যার সঙ্গে বিয়ে দিল, তার চারজন ছেলেমেয়ে। তার মন পাথরের মত কঠিন। শ্বশুর বাড়ীতে ক্রীতদাসীর মত খাটতে হয়। মায়া মমতার লেশমাত্র নেই। দম বন্ধ হয়ে যায় রীণার।

একদিন তার জ্বর হল। কাজ করতে পারেনি বলে মার খেতে হল। পারের দিন খুব ভোরে সে বাপের বাড়ী পালিয়ে গেল।

সকালে উঠে মাসুম দেখতে পেল বুবু বারান্দায় বসে রয়েছে। তার মনে আনন্দ ধরে না। বলল, বুবু, তোমাকে আর যেতে দেব না। তুমি চলে গেলে কিছু ভাল লাগে না। রীণা ছোট ভাইকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে ফেলল। বলল, না ভাই আর যাব না। পরের দিন তার স্বামী এসে সালিশ ডাকল। রীণার এক কথা, ওর একটা বৌয়ের দরকার নেই, ওর দরকার একটা গরুর। মুরুব্বীরা তাকে স্বামীর বাড়ী ফিরে যেতে হুকুম দিল। সে বলল, তার চেয়ে নদীতে ডুবে মরতে রাজী আছি। মুরুব্বীরা ওর বাবাকে বলল, এক সপ্তার বেশী যদি মেয়ে তোমার ঘরে থাকে, তবে তোমাকে একঘরে হতে হবে। সাভারে গার্মেন্টসের এক ছোট

• তোমাকে বাসের ভাড়া দিতে হয় না ?

• না তো, আমি ডিম বিক্রি করলে মালিকের লাভ। যাত্রীরা খুশী হয়, কোম্পানির সুনাম করে।

• আচ্ছা, সাভার পর্যন্ত গিয়েছ কোন দিন ?

• গিয়েছি মানে? সাভার, ঢাকা.... আমি প্রতিদিনই যাই।

আমাকে সাভার পর্যন্ত নিয়ে যেতে পার? আমার যেতে হবে, আমার বুবুকে আনতে হবে। আমি না গেলে ওর কি অবস্থা হবে, তার ঠিক নেই। মাসুমের চোখ ছলছল করতে লাগল।

আমিরুল তার ঘাড়ে এক থাপ্পড় বসিয়ে বলল, এ আর এমন কঠিন কি! চল, আমি কন্ডাক্টরকে বলে-কয়ে তোমাকে পার করিয়ে দেব। দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কিন্তু, বসার জায়গা পাবে না। চল।

সাভার পৌঁছাতে এক ঘন্টা লাগল। তার আগেই আমিরুলের সমস্ত ডিম বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। মাসুমকে বলল, এখানে নামতে হবে। তারপর দু'জনে মিলে খুঁজতে লাগল। দুই-তিন ঘন্টা খুঁজল।

রাত আটটায় একটা ঘরে ঢুকল। সেলাই মেশিনের সামনে বসা ঐ সব মেয়েদের ভীড়ে খুঁজতে লাগল। হঠাৎ একটা মেয়ে চিৎকার করে উঠল, মাসুম! চেয়ার থেকে উঠে তার দিকে দৌড়াল ও তাকে বুকে আঁকড়ে ধরল। মনে হল সে পানিতে ডুবে যাচ্ছে আর মাসুম তার বাঁচার শেষ উপায়।

রীণা তাদের নিয়ে এল ছোট একটা ঘরে। সেখানে আরও তিনজন মেয়ের বিছানা পাতা ছিল। ডাকল, খালাম্মা! এই দেখ, মাসুম এসেছে! ছেলে দু'জন খেতে বসল। মাসুম খেতে খেতে বলল, বুবু, তোমাকে নিতে এলাম। কাল সকালে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাব।

• কে তোমাকে পাঠিয়েছে ?

৫৭১। কোলা ব্যাঙ

তেলা মিয়ার ছেলে রবিউল ক্লাস ফাইভে পড়ে। মাষ্টার তার উপর সন্তুষ্ট। এই কয় মাস ধরে ছেলেটার উপর কোন চাপ না দিয়েও লেখাপড়ার প্রতি তার উৎসাহ বেড়ে গেছে। স্কুলের লাইব্রেরী আর কুলাচ্ছে না। এখন পাবলিক লাইব্রেরী থেকে বই ধার করে আনে। এক একটা বই পড়া শেষ হয়ে গেলে মাষ্টার তাকে দশ মিনিট সময় দেয় যেন সে বইয়ের সারমর্ম অন্যান্য ছাত্রদের শুনাতে পারে।

আজ রবিউল বাবাকে বলে, আমাকে একটু সাহায্য করবে আব্বা? দেখ এই বড় বৈয়ম ধার নিয়েছি দোকানদারের কাছ থেকে। ভিতরে কয়টা মাছের পোনা ও ব্যাঙের পোনা রয়েছে। পানিসহ সাত কেজির মত ওজন হবে। এটা স্কুলে নিতে না পারলে আমি বইটার বিষয় আলোচনা করতে পারব না।

বাবার কৌতুহল হল, রবিউল মাছ ও ব্যাঙের পোনা সম্বন্ধে কতটুকু জানে। বৈয়ম ঝাঁকি দিতে দিতে স্কুল পর্যন্ত নিয়ে গেল। ক্লাস শুরু হচ্ছিল। ছাত্ররা উৎসুক হয়ে বৈয়মটার দিকে চেয়ে রইল। তেলা মিয়া পিছনের ব্যাঞ্চে গিয়ে বসল।

মাষ্টারের অনুমতি পেয়ে রবিউল তার আলোচনা শুরু করল। আমি মাছ ও ব্যাঙের বিষয়ে একটা বই পড়েছি। সে অনেক কথা। কিন্তু আসল কথা তোমরা এক মিনিটের মধ্যে বুঝতে পারবে। এই বৈয়মের কাছে আসতে হবে।

সবাই এসে বৈয়ম ঘিরে দাঁড়াল। তখন রবিউল একটা শিশি বের করল, এই দেখ, এর ভিতরে ধানের পোকা মারার ওষুধ আছে। এই ওষুধ মেশিন দিয়ে ধানের ক্ষেতে স্প্রে করে দিতে হয়। আমি বাবার কাছ থেকে এই ওষুধ চেয়ে এনেছি। এবার দেখ কি হয়।

প্রফেসর আসাদুল হক উত্তর দিলেন, আমি আসব আগামী মাসের পনের তারিখে। পোকা মারার সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধ নিয়ে আসব ও তাই নিয়ে আলোচনা করব।

পনের তারিখ সন্ধ্যায় চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ীর উঠানটা মানুষে ভরে গেল। প্রফেসর তার আলোচনা শুরু করলেন।

• আমি ধানের পোকা মারার জন্য জগতে যত ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে সে সব জানি, একটিও বাকী নেই। আমি ইউরোপে গেছি, আমেরিকায় গেছি, চীনদেশেও গেছি। সবচেয়ে ভাল ওষুধ আমি জানি। সেই ওষুধ দেখাতে এলাম। চেয়ারম্যান সাহেব, সেই টিনটা নিয়ে আসুন।

দোকানদাররা কেরোসিনের টিন কেটে একপাশে কাঁচ লাগায় যাতে ভিতরের জিনিষ দেখা যায়। সে ধরনের একটা টিনের মধ্যে আটকিয়ে রাখা হয়েছিল ত্রিশটা ফড়িং।

হ্যাজেক লাইটের আলো পেয়ে সবগুলো টিনের মধ্যে লাফাতে শুরু করল। প্রফেসর বলল, এর ভিতর আমি ত্রিশটা ফড়িং গুনে রেখেছি। এবার দেখ কি হয়। রবিউল তোমার কোলা ব্যাঙ নিয়ে এস।

রবিউল কোথা থেকে বড় এক কোলা ব্যাঙ নিয়ে হাজির হল। ঢাকনিটা খুলে টিনের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। তারপর টিন বন্ধ করে একটা মোটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। তিনশো লোক উঠানে বসে ছিল। সবাই এত

৫৭৩। রসগোল্লার গান

রসে ভরা রসগেল্লা মজার আবিষ্কার
ভক্তিভরে আমরা তোমায় করি নমস্কার ॥

রসগোল্লার ময়রাগুলো স্বর্গে যাবে ভাই,
সাধু ব্যক্তির সনে ওরা সবাই পাবে ঠাই।
সেথায় যেন হাঁড়িভরা রসগোল্লা পায়
সাধু-সাধ্বীর ভীড়ে যেন হাড়ি না ফুরায় ॥

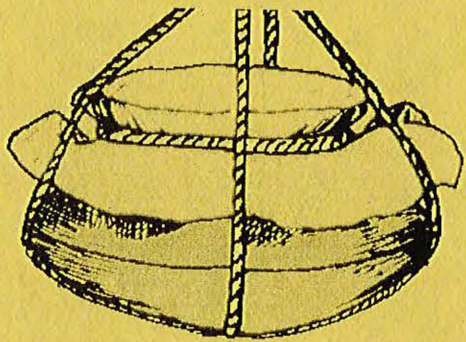

চোরে যদি চুরির পথে রসগোল্লা পায়
চুরির কথা ভুলে গিয়ে রসগোল্লা খায়।
জ্ঞানী-গুণী খেয়ে-দেয়ে করে গুনোগান
রসগোল্লার রসে মজে যত বুদ্ধিমান।

জীবন পথে তোমরা যদি কোন দুঃখ পাও,
দোকান থেকে কিনে এনে রসগোল্লা খাও।
বোকাগুলো রসগোল্লার মর্ম বোঝে না,
মাথায় যারা বুদ্ধি রাখে, এ ভুল করে না।

একটা রসগোল্লা দিলে শত্রু আপন হয়,
ঝগড়া-ঝাঁটি ভুলে গিয়ে মিষ্টি কথা কয়।
বোকাগুলো রসগোল্লার মর্ম বোঝে না
মাথায় যারা বুদ্ধি রাখে, এ ভুল করে না।

• বেচারা ভদ্র ব্যবহার শেখেনি বটে। কিন্তু..... আজ তোমরা স্কুল থেকে ফিরে এলে কি না, এখনও জানতে পারলাম না। তোমরা কি আমার সঙ্গে একটা কথা বললে ? আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি তা খোঁজ করলে ?

• আমরা কি ওর মত অভদ্র ? শুনলে কেমন করে ভাত চাইল। "ভাত খেতে দাও তো"। মনে হচ্ছিল ভাত যেন তার! আর শেষে কেমন করে কিছু না বলে চলে গেল! আমার রাগ হচ্ছিল! তুমি কিছু বললে না যে!

• ঐ বুড়ো লোকটাকে আমি ভদ্রতা শিখাতে যাব ? ... আচ্ছা বাবা, তোমার এত রাগ কিসের? তার সঙ্গে তোমার কি তফাত, বল তো ? তুমি ভাত খেতে বসলে ভাত চাও কেমন করে? মনে হয় যেন নিজেই কামাই করে, নিজেই রান্না করে তোমার চাকরকে ভাত আনতে বলছ। পার্থক্যটা কোথায় শুনি ?

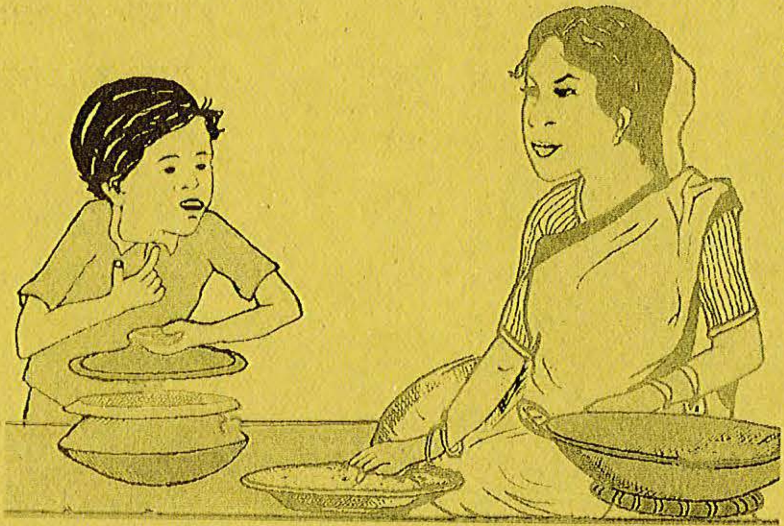

• আমি তো... আমি তো ভিক্ষুক না।

• জানি বাবা, তুমি আমার ছেলে। আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার সব অন্যায় ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু তাই বলে কি তুমি আমাকে প্রতিদিন মারবে ?

• আমি তোমাকে..... আমি তোমাকে ......

• একদিন তুমি বুঝবে, বাবা। বুঝবে তোমার একটা কথার কত দাম। আর তোমার মুখের হাসির কত দাম। রান্না ভাল হলে তুমি কোন দিন

৫৭৫। বিদ্যুত পন্ডিত

• মা, আমি আর স্কুলে যাব না।

টম এই তিন মাস ধরে স্কুলে যাচ্ছে। তার ছয় বছর বয়স। আজ স্কুল থেকে ফিরে এসে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে।

• কি হয়েছে, বাবা ? স্যার মেরেছে নাকি?

আমি খাতায় একটা মেশিনের ছবি আঁকছিলাম। স্যার জিজ্ঞেস করেছে চার পাঁচে কত হয়, আমি তার কথা বুঝতেই পারিনি। স্যার বলেছে, আমার দ্বারা কিছু হবে না। আমি নাকি আস্ত গাধা।

• আচ্ছা দেখি তোমার ছবি। এটা কিসের মেশিন ?

• দেখতে পাচ্ছ না ? এটা আমাদের উঠান, গম রোদে শুকাতে দেওয়া হয়েছে। পাখিরা খেতে আসলে অমনি জালে ধরা পড়বে।

• তোমার অনেক বুদ্ধি, স্যার বুঝতে পারেনি।

রাত্রে মা বাবাকে বলল, কাল থেকে ছেলেটাকে নিজেই পড়াব।

• তোমার সময় কই?

• ওর জন্য বেশী সময় লাগবে না।

• পনের দিন পর বাবা বলল, টম, তুমি বেশী পড় না তো?...

• কেন? মাকে জিজ্ঞেস কর। মা যা শিখায় একবার শুনলেই আমার মনে থাকে। তাছাড়া আমার খাতাটা দেখ, কত কি আবিষ্কার করেছি! আচ্ছা বাবা, একটা ম্যাচকাঠি দিয়ে কত বড় আগুন জ্বালানো যায়?

• একটা ম্যাচকাঠি দিয়ে সারা জগত পুড়িয়ে দেওয়া যায়।

• ধ্যাৎ, তা কি করে হয়?...

• টম চলে গেলে মা ছেলেটার গবেষনা ঘর ওর বাবাকে দেখাল। রঙ-বেরঙের নুড়ি, প্রজাপতি, গাব্‌রে পোকা। কয়টা শিশিও ছিল, তাদের গায়ে লেখা "বিষ" যেন কেউ হাত না দেয়। শেষে একটা ময়লা প্যান্ট

করতে লাগল, ছাপাল, বিলি করল। বারো বছরের ছেলের সংবাদপত্র সব যাত্রীরা পছন্দ করল। বছরে আটাশখানা করে ছাপিয়ে বিলি করত। পরিশ্রম ছিল ধারনার বাইরে। তাতে কি, তার আনন্দের সীমা ছিল না।

কিন্তু আস্তে আস্তে মন ফিরে এল তার জীবনের আসল কাজে। একদিন তার গবেষণা ঘর বড় করল ও বিদ্যুৎ শক্তির বিষয় যত বই পেল রাক্ষসের মত গিলতে লাগল। তারপর টেলিগ্রাফ কোম্পানীতে চাকরি ধরল। লাইব্রেরী ছিল তার সত্যিকার থাকার ঘর। তার সব টাকা যেত শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্র কেনার পিছনে। সবাই তাকে পাগল বলত। একদিন হঠাৎ চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ছোট একটা পুটুলী বেঁধে আমেরিকার সবচেয়ে বড় টাউন নিউ ইয়র্ক রওনা হল। পকেটে এক পয়সাও নেই। টম সোজাসুজি সেন্ট্রাল ব্যাংকে চাকরীর জন্য দরখাস্ত করল। ম্যানেজার বলল, তোমার কি ডিগ্রী আছে?। টম উত্তর দিল, আমার কোন ডিগ্রী নেই, আমি যা জানি, তা নিজে নিজে বই পড়ে ও পরীক্ষা করে শিখেছি। বরং কি করতে পারি তাই দেখুন। ম্যানেজার সাহেব আর কিছু না বলে তাকে বের করে দিলেন।

কিন্তু হঠাৎ ব্যাংকের ছয়শ কর্মচারী হৈ-চৈ করতে লাগল। কাজ বন্ধ। ব্যাংকের টেলিগ্রাফ নষ্ট হয়ে গেছে। কেউ সারাতে পারছে না। টম বলল, একটা স্ক্রু ড্রাইভার দাও। পাঁচ মিনিটের মধ্যে যন্ত্রটা চালু করে দিল। টম চাকরী পেল। তার মাইনে দশ হাজার টাকা। তাই দিয়ে গবেষনা চালাতে লাগল। একদিন ম্যানেজারকে বলল, আমার এই যন্ত্রটা কিনবেন ? এতে টেলিগ্রাফের সংকেত

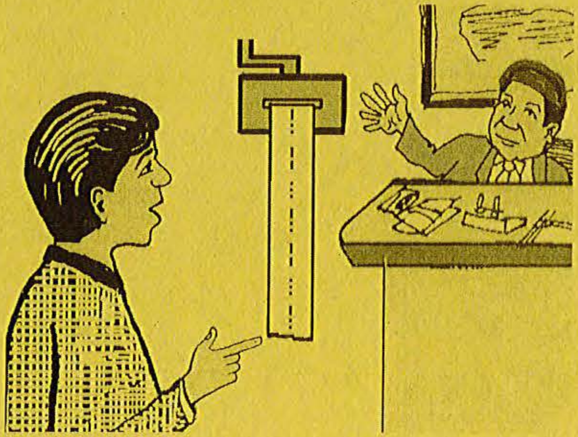

৫৭৬। ঈসা খাঁ

তিনশ বছর আগের কথা। সে সময় দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিল মোগল সম্রাট আকবর। একদিন সেনাপতি মানসিংহ তার দরবারে উপস্থিত হল। বাংলাদেশের মানুষের কথা উঠল। সম্রাট বলল, ঐ জাতির মূল্য আছে। শান্তির সময় যেমন কর্মঠ, যুদ্ধের সময় তেমনি ভয়ংকর।

এই কথা মানসিংহ সেনাপতির গায়ে লাগল। বলল, জাঁহাপনা, হুকুম করুন, আমি এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশ আপনার পায়ের তলে নিয়ে আসব।

- মানসিংহ, তুমি ওদের চেনো না। ভাল্লুক যেমন নিজের গুহা রক্ষা করে, ওরাও তেমনি। যতক্ষণ ভাল্লুককে আক্রমণ না কর, ততক্ষণ জানবে না তার নখ কত ভয়ানক ভাবে আঁচড় কাটতে পারে। এর আগে যারা তাদের আক্রমণ করতে গেছে, তারা নিজের সম্মান বিসর্জন দিয়ে শুধু প্রাণ নিয়ে কোনমতে ফিরে এসেছে।
- জাঁহাপনা, এর আগে মানসিংহের মত সেনাপতি আপনার ছিল না।

- তা বটে। তবে বাঙালীদের সঙ্গে ছিল ঈসা খাঁ। সে এখনও মরেনি।
- মানসিংহ কাউকে ভয় করে না।
- বেশ, হুকুম

আমি ঈসা খাঁর দূত। আমি ঢুকেছি নিজের পায়ে হেঁটে। প্রহরীরা বিশ্রাম করছে। এই নিন আপনার চিঠি আর এই আপনার তলোয়ার।

মানসিংহ তাকাল ঐ কৃষকের দিকে। তার মুখে কোন ঠাট্টা নেই, কোন ভয়ও নেই। যে দুর্দান্ত কাজ করেছে, তার জন্য কোন গর্ব নেই। যেন এক বয়স্ক লোক কৌতুকের সঙ্গে শিশুদের খেলা দেখছে, যুদ্ধের খেলা।

মানসিংহ পত্রটা পড়লঃ আমি ঈসা খাঁ দিল্লী সম্রাটের সেনাপতি বীর মানসিংহকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আরও জানাচ্ছি যে, আমি ও আমার বাঙালী সেনাদলের কেউ ভীরু বা কাপুরুষ নই। তবে একান্ত দরকার না হলে, নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করতে আমাদের লজ্জা হয়। এই দেশ অধিকার করার জন্য বৃথা সৈন্যদের প্রাণ ক্ষয় করার প্রয়োজন নেই। যদি আপনার সাহস থাকে, তবে আসুন, আমরা দু'জনে যুদ্ধ করি। যার জয় হবে, এই দেশ তার অধীনে থাকবে।

মানসিংহ অনেক্ষণ চুপ করে রইল। যে ফাঁদ পেতেছিল সেই ফাঁদে নিজেই পড়ে গেছে। সম্মান রক্ষা করার জন্য প্রস্তাবটা মেনে নিল।

তিন দিন পর দ্বন্দযুদ্ধ হল। দুই দিক থেকে দু'টি সেনাদল যুদ্ধ দেখছিল। ঈসা খাঁ হাতে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে গেল। মানসিংহ বলল, এবার আসুন।